২০ রাকা'আত তারাবীহ্র নামায সুন্নতে মুআক্কাদা এবং পূর্ণ মাসের তারাবীহ্র নামাযের মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করাও সুন্নতে মুআক্কাদা। সুতরাং এই মাস প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য বড় রহ্মত ও বরকতের মাস। ছবর ও ধৈর্য শিক্ষার মাস। খরচের মাস। যাকাত দান করিয়া ৭০ গুণ ছওয়াব হাছিল করার মাস। এইজন্য যাকাত দানকারীরাও অধিকাংশ এই মাসেই যাকাত খয়রাত দান করিয়া থাকেন। কারণ ইহাতে ৭০ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। এই মাস বিশেষভাবে কোরআন পাঠের মাস। কোরআনের হাফেযগণ কোরআন পাঠ নিশ্চয় বেশী করিবেন। যাঁহারা নাযেরা পড়েন তাঁহাদের বেশী পড়া দরকার। যাহারা কোরআনের হাকীকতের অন্বেষণকারী, তাঁহাদেরও এই মাসেই রোযার পবিত্রতার সঙ্গে এবং আত্মার পবিত্রতার সঙ্গে কোরআনের হাকীকত (নিগূঢ় তত্ত্ব) বেশী অন্বেষণ করা দরকার। কারণ, এই মাসেই যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ্র (দঃ) উপর কোরআন প্রথম নাযিল হইয়াছে এবং তিনি সংবৎসরের অবতীর্ণ কোরআন হযরত জিব্রীলে আমীনের সঙ্গে দওর করিয়াছেন। (পরস্পর একজন আরেক জনকে কোরআনের হেফয ও মুখস্থ শুনানের নাম দওর।) আর এই মাসেই আল্লাহ্র রহমত বেশী নাযিল হয়। এইজন্য এই মাসে সবদিক দিয়া আত্মার পবিত্রতার সঙ্গে কোরআন চর্চা বেশী করা দরকার। কিন্তু খবরদার! কোরআন চর্চার মধ্যে নিয়ত খারাব করা এবং হীনতা মনে আনা চাই না। কিছু পয়সার লোভে টাকা চুক্তি করিয়া নিয়ত খারাব করিয়া কোরআন পড়া চাই না। কোরআন পড়া একমাত্র আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্র পেয়ারা হওয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্র মহব্বত লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যাঁহারা তারাবীহ্র মধ্যে কোরআন শুনিবেন বা কোন আলেমের মজলিসে কোরআনের তফসীর শুনিবেন বা হযরতের জীবনী আলোচনা শুনিবেন, তাঁহাদের কর্তব্য—জান প্রাণ দিয়া, যথাসাধ্য মাল খরচ করিয়া ঐ হাফেয বা আলেমের মর্যাদা রক্ষা করা।

রমজান মাসের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা খাছ লোকদের পক্ষে আল্লাহ্র খাছ রহ্মত আরও বেশী করিয়া হাছিল করার আরও একটি উপায়। অর্থাৎ, মসজিদে নির্জনে নীরবে বসিয়া আল্লাহ্র ধ্যান করা, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা। মসজিদের মধ্যে বাজে কথা না বলিয়া, বাজে কাজ না করিয়া আল্লাহ্র দুয়ারে পড়িয়া থাকিয়া খাছভাবে আল্লাহ্র ধ্যানে পড়িয়া থাকা, ইহারই নাম এ'তেকাফ। খাঁটি এ'তেকাফ দ্বারা সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়, দিল ছাফ হইয়া যায় এবং আল্লাহ্র নিকট খাছ দরজা হাছিল হয়।

রোযার ঈদের চাঁদ—শাওয়াল

চাঁদ সম্বন্ধে লোকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে। কেহ মনে করে, পঞ্জিকার হিসাব মতে বা অমাবস্যা-প্রতিপদের হিসাব মতে রোযা রাখিতে বা রোযা ছাড়িতে হইবে। কেহ কেহ মনে করে, বিজ্ঞানের হিসাব মতে, আবহাওয়ার হিসাব মতে, আবহাওয়া বিভাগের ঘোষণা মতে রোযা রাখিতে, রোযা ছাড়িতে ও ঈদ করিতে হইবে। এগুলি ভুল ধারণা। কেহ কেহ ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া বিমানে চড়িয়া চাঁদ দেখার চেষ্টা করেন, কেহবা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদ দেখিবার চেষ্টা করে, কেহবা দূর-দূরান্ত হইতে বেতার বা টেলিফোনযোগে খবর আনার চেষ্টা করে। এইগুলি সব বৃথা আড়ম্বর। আমাদের ইসলাম ধর্ম সর্বকালের সর্বদেশের সর্বজনের জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত সহজ সরল সঠিক ধর্ম। এর মধ্যে এত আড়ম্বর বা এত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করার কোনই স্থান নাই। বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞান। ধর্মের মধ্যে মানুষের জ্ঞানের দখল নাই। সুতরাং

বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং ধর্মের সঙ্গে বিরোধ নাই। বিজ্ঞান চাঁদের জন্মতারিখ বলিতে পারে, কিন্তু চাঁদের জন্মতারিখে ঈদ করিবার আদেশ বিজ্ঞান দেয় না। পক্ষান্তরে ধর্ম চাঁদের জন্ম তারিখে নয়, বরং চাঁদ দেখার তারিখে ঈদ করিতে বলে। অতএব, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কোথায়? অবশ্য মানুষের কল্পনার সঙ্গে এবং মানুষের মনের চাহিদার সঙ্গে ধর্মের বিরোধ আছে । এক্ষেত্রে মানুষকে , মানুষের মনকে ধর্মের অনুগত হইতে হইবে। ধর্মের সঙ্গে বিরোধ করিতে হইবে না। প্রাকৃতিকভাবে যে অঞ্চল ও সার্কেলগুলি আছে, তাহাদের কেন্দ্রে যখন বিশ্বস্তসূত্রে স্পষ্ট চোখে চাঁদ দেখা প্রমাণ হইয়া যাইবে, তখনই চাঁদ ধরা হইবে, তখনই রোযা ছাড়া যাইবে। নতুবা হাদীস শরীফে পরিষ্কার হুকুম আছে—যদি মেঘের কারণে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে ৩০ দিন পুরা করিয়া তারপর নূতন চাঁদ ধরিতে হইবে। এখানে বিজ্ঞানের কের্দানী দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যাইবে বা ২৯শে রমযান মেঘের কারণে চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হইলে যে সন্ধ্যায় ৩০ রোযা পুরা হইয়া যাইবে, তারপর দিন ১লা শাওয়াল ঈদের দিন ধরা হইবে। ঈদের দিন খুশীর দিন। গরীবদেরও খুশীর বন্দোবস্ত ধনীদের করিতে হইবে। ঈদের নামাযের পূর্বেই সকাল সকাল প্রত্যেক মালদার ব্যক্তি নিজের বরং নিজ পরিবারবর্গের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে ৮০ তোলা সেরের দুই সের গমের পরিমাণ নগদ পয়সা বা অন্য খাদ্যশস্য গরীবদের দান করা উচিত। ইহাকে “ছদকায়ে ফেৎরা” বলে। ইহা মালদারের উপর ওয়াজিব। ইহা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সকল মুসলমানের একত্র হইয়া ময়দানে গিয়া ঈদের নামায পড়া উচিত। হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার ভুলিয়া সকল মুসলমান সমবেদনাসম্পন্ন ভাই ভাই হইয়া পরস্পর মিলামিলি কোলাকুলি করা উচিত।

এই মাসে ৬টি নফল রোযা আছে। ইহাকে ঈদের ‘শশ রোযা’ বলে। ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদের দিন বাদ দিয়া বাকী মাসের ভিরত এই ছয়টি রোযা রাখার ফযীলত ছহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

কোরবানীর ঈদ—যিলহজ্জ

মোট ১২টি চাঁদ— ১। মুহার্‌রম, ২। ছফর, ৩। রবিউল আউয়াল, ৪। রবিউস্‌সানী, ৫। জোমাদাল উলা, ৬। জোমাদাল উখরা, ৭। রজব, ৮। শা’বান, ৯। রমযান, ১০। শাওয়াল, ১১। যিলকদ, ১২। যিলহজ্জ। এইসব চাঁদ এবং এইসব মাস আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কোন মাসেই নহুসত নাই, নহুসত নিজের কাছে। সৎকাজ করিলে, সৎ চেষ্টা করিলে নহুসত নাই। বদকাজ করিলে, নিশ্চেষ্ট থাকিলে নহুসত আছে। সৎচেষ্টা করিয়া হাছিল করিলে সব মাসেই আল্লাহ্‌র রহমতের বরকতের দরওয়াজা খোলা আছে। অবশ্য ছফর, জোমাদাল উলা এবং জোমাদাল উখরা এই তিন মাসের কোন খাছ ফযীলত শরীঅতে পাওয়া যায় নাই। যিলকদ মাসেরও কোন খাছ ফযীলত নাই; স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিলকদ মাস চারিটি পবিত্র ও মর্যাদাশীল মাসের একটি মাস। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে, যিলকদ মাসের কোনই খাছ ফযীলত নাই বা যিলকদ মাস নহুসতের মাস। ছফর মাসে আমাদের হযরত বিমার পড়িয়াছেন, তা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, এই মাস নহুসতের মাস।

চান্দ্র বৎসরের শেষ মাস যিলহজ্জ মাস। যিলহজ্জ মাস অতি পবিত্র মাস। এই মাসের ৯ই তারিখে সারা পৃথিবীর বহু মুসলমান আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হইয়া হজ্জের ফরয পালন করে। যাহারা হজ্জে শরীক হইতে পারে না তাহারা ঐদিন নফল রোযা রাখিয়া বহু নেকীর অধিকারী হয়। এমন কি, দুই বৎসরের ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ হয়। ১০ই তারিখে ঈদের নামায পড়িতে হয় এবং আল্লাহ্‌র নামে গৃহপালিত পশু, গরু, ছাগল, মেষ, উট ইত্যাদি কোরবানী করিতে হয়। ৯ই তারিখের ফজর হইতে ১৩ই তারিখের আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর প্রত্যেক নামাযীকে একবার (৩ বারও পড়া যায়) 'তকবীরে তশরীক' বলিতে হয়। তকবীরে তশরীক আল্লাহ্‌র বড়ত্ব এবং আল্লাহ্‌র একত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেওয়া যে, আমরা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় অন্য কাহাকেও মানি না। এক আল্লাহ্‌কে মানি। তকবীরে তশরীক এই—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

তকবীরে তশ্‌রীকের পিছনে এবং কোরবানীর পিছনে ঐতিহাসিক পটভূমিকা এই যে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পুত্র কোরবানী করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। পিতা হযরত ইবরাহীম ছুরি হাতে লইয়া প্রস্তুত এবং পুত্র ইসমাঈলও ছুরির তলে গলা রাখিয়া প্রস্তুত। এমন সময় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে দ্বিতীয় আদেশ লইয়া হযরত জিবরীল 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন। হযরত ইসমাঈল ছুরির তল হইতে জওয়াব দিলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর"—তুমি আমাদের খোদা নও, আমাদের খোদা আল্লাহ্। তৎপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় আদেশ পাইয়া প্রথম আদেশকে মনছুখ মনে করিয়া আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ঘোষণা করিলেন এবং আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিলেন। বলিলেন—"আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ"। এই স্মৃতি রক্ষা করিয়া আল্লাহ্‌র যখন যে আদেশ হইবে, তখন সেই আদেশকে শিরোধার্য করিয়া নিতে হইবে। এই শপথ সজীব রাখার জন্যই বছরে বছরে নিজের জানের চেয়ে পেয়ারা পুত্রের পরিবর্তে একটি গরু, বকরী বা উট কোরবানী করিয়া নিজের নফ্‌সানিয়াতকে আল্লাহ্‌র সামনে কোরবানী করিতে হয়। ১০ই তারিখ ঈদের নামাযের পর হইতে ১২ই তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোরবানীর সময়। এর পরে বা আগে করিলে কোরবানী হইবে না। ১০ই, ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই এই চারি দিনকে "আইয়্যামে তশরীক" বলে। এই চারিদিন রোযা রাখা হারাম।

কতিপয় ভুল ধারণা

বিবেকের বিকৃতির এই জমানায় কেহ কেহ বিবেকের বিকৃতিবশতঃ আল্লাহ্‌র নামে পশু কোরবানীকে কালিপূজার পাঠা বলির সমান বলিয়াছে। ইহা বক্তার মস্তিষ্কের বিকৃতি বৈ আর কিছুই নহে। কারণ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী (উৎসর্গ বন্দেগী) এবং অন্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে কোরবানী এক হইতে পারে কি? আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। তাঁহার উদ্দেশ্যে বন্দেগী, তাঁহারই উদ্দেশ্যে কোরবানী হইতে পারে। অন্য দেবদেবী—সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা না কি যে, তাহাদের নামে, তাহাদের উদ্দেশ্যে বন্দেগী (পূজা) বা কোরবানী (বলি বা উৎসর্গ) হইবে? ইহা নিছক মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা।

কেহ কেহ জিন্দা বা মুরদা কবরস্থ পীরকে গায়েব জাননেওয়ালা, মকছুদ পুরা করিয়া দেনেওয়ালা, অদৃশ্য জ্ঞাত এবং বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী মনে করে। ইহা নিছক ভুল ধারণা—ঘৃণ্য শির্‌কী আক্বীদা।

কেহ কেহ পাশ্চাত্য বর্বরতার প্রভাবে পড়িয়া অন্ধ অনুকরণের প্রতিক্রিয়াশীলতার বশবর্তী হইয়া বলে যে, পর্দা ফরয পালন করিলে নারী জাতিকে পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। নারী জাতিকে পুরুষজাতি কর্তৃক পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। নর ও নারীর সমান অধিকার থাকিবে না, ইত্যাদি। ইহা নিছক ভুল ধারণা এবং কাম-কুক্কুটদের কামভাব চরিতার্থ করিয়া নারী জাতিকে ভোগের বস্তু বানাইবার একটি ফন্দি মাত্র। পর্দা স্বয়ং আল্লাহ্ কোরআনের আয়াতের দ্বারা ফরয করিয়াছেন। কোন মৌলভী-মাওলানা ফরয করেন নাই। নারী জাতির যে কাজ সে কাজে পর্দা পালনের কারণে কোন বাধা থাকে না। নারীজাতিকে পুরুষেরা পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে না বা হিন্দু ও খৃষ্টানদের ন্যায় মুসলিম পুরুষেরা নারী জাতিকে দাসীরূপে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের সমান অধিকার হইতেও বঞ্চিত করে না। যদি কেহ ব্যক্তিগতভাবে নফ্‌সানিয়াতের বশে করে, তবে তাহাকে ইসলামী শরীঅয়তের দ্বারা শাসন করিতে হইবে। কোরআন পাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিদ্যমান যে, নারী জাতি তাহারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে নিজেদের সৌন্দর্য্য অন্য পুরুষকে দেখাইবে না। এই নির্দেশের দার্শনিক নিগূঢ়তত্ত্বও আছে যে, লোভনীয় মূল্যবান জিনিসকে অন্যের লোলুপ দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখা প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানশীল মানুষেরই কর্তব্য। এর জন্যই প্রত্যেক হীরা কাঞ্চন, মণি-মাণিক্যের অধিকারীকেই লোলুপ দৃষ্টি থেকে তার মূল্যবান সম্পদকে আড়ালে রাখিতে হয়। প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানশীলা নারীর কাজেই তার সতীত্বের মূল্য হীরা, কাঞ্চন, মণি-মানিক্যে থেকে অনেক বেশী। এই দায়িত্বজ্ঞানশীলতাই প্রত্যেক নারীকে বাধ্য করে তাহার সৌন্দর্য্যকে পরপুরুষ থেকে আড়লে লুকাইয়া রাখিতে। বিশেষতঃ যখন লোভনীয়তা এবং আকর্ষণ দুই তরফ থেকে হয়, তখন এই দায়িত্ব আরও শতগুণে বাড়িয়া যায়। অতএব, দেখা গেল যে, নারী নারীত্ব রক্ষার্থেই পর্দা করিতে বাধ্য। কোন পুরুষের আদেশে বা পুরুষের অত্যাচারে নয়। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা বিধাতা আল্লাহ্ কোরআনে পাকে নারীর দায়িত্বটা নারীদেরকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই ফরয পর্দা পালন করাতে নারীর সমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, সমান অধিকারের অর্থ কি? যদি সমান অধিকারের অর্থ এই হয় যে, অধিকারের পরিমাণও সমান হইবে। তবে নারী একা কেন সন্তান পেটে ধারণ করার কষ্ট বহন করিবে? পুরুষ কেন এ কষ্ট বহন করিবে না? নারীর শরীর গঠন কেন কোমল এবং পুরুষের শরীরের গঠন কেন কঠোর হইবে? কোরআনের পাতায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিচারে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশ পাইবে’—সূত্রে নারী কেন পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়, আর اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ সূত্রে পরিবার পরিচালনার নেতৃত্ব কেন নারীকে না দিয়া নরকে দেওয়া হইয়াছে? বুঝা গেল, সমান অধিকারের অর্থ অধিকারের পরিমাণে সমান সমান নয়। যার যে পরিমাণ অধিকার বিধাতার তরফ হইতে নির্ধারিত আছে, সে সেই পরিমাণই পাইবে; কিন্তু মূল্য অধিকারে বিচারের বেলায় সবই সমান। কেহ দুই পয়সা পাইবে, কেহ দুই হাজার পাইবে। সকলেরই সমান অধিকার-এর অর্থ এই নয় যে, দুই পয়সাওয়ালাকে দুই হাজার দিতে হইবে বা দুই হাজারওয়ালাকে দুই পায়সা দিতে হইবে। না, না, সে অর্থ নয়। অর্থ এই যে, দুই পয়সাওয়ালারও বিচার পাওয়ার ঠিক ততটা অধিকার, যতটা অধিকার দুই

হাজারওয়ালার। বিচার এ নয় যে, দুই হাজারওয়ালার বিচার ত করিবেন, কিন্তু দুই পয়সাওয়ালা থাকিলে তখন বিচার হইতে গাফলতি করিবেন। তা নয় তাহাকেও সুবিচার দান করিতে হইবে ঠিক ততখানি যত্ন সহকারে যতটা যত্ন সহকারে তিনি সুবিচার করিয়া থাকেন দুই হাজারওয়ালার বেলায়।

যবাহ করিবার ফতওয়া

ইসলাম ধর্মের পবিত্র আদর্শে কোন হালাল জীব খাইতে হইলে তাহাকে গলা মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া খাইলে তাহা হালাল হইবে না বা মেশিনে গলা কাটিয়া খাইলে তাহা হালাল হইবে না; বরং স্বয়ং যিনি ঐ জীবের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া بسم الله الله اكبر (বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর) বলিয়া কোন ধারাল অস্ত্রের দ্বারা জীবের গলা কাটিতে হইবে, তবেই ঐ জীব খাওয়া হালাল হইবে, নতুবা হালাল হইবে না। যেমন হালাল জীব নিজস্ব সম্পত্তি হইলে হালাল হইবে, ঘুষের বা চুরির বা জোরদখলের জিনিস হইলে হালাল হইবে না।

সালাম, মোছাফাহা, মোয়ানাকা

দুইজন মুসলমান চাই যে কোন দেশের, যে কোন সমাজের, যে কোন বর্ণের, যে কোন ভাষার হউক না কেন দুইজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে একে অন্যকে সালাম করা এবং সালামের যখন তখন জওয়াব দেওয়া ইসলামের আদর্শ। সালামের জন্য যে বাক্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহা এই—'আস্‌সালামু আলাইকুম' আর জওয়াবের জন্য এই বাক্য নির্ধারিত—'ওয়াআলাইকুমুস্-সালাম'। এত সুন্দর বাক্য এত সুন্দর পদ্ধতি অন্য কোন ধর্ম বা জাতির মধ্যে নাই। সালামের অর্থ "আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক এবং আমি আপনাকে আমার তরফ হইতে পূর্ণ নিরাপত্তার এগ্রিমেণ্ট দান করিতেছি।" দৈনিক মোলাকাতের সময় বা একদিনে কয়েকবার মোলাকাত হইলে প্রত্যেকবার মোলাকাতের সময় প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানকে হাসিমুখে সালাম করিবে। বড় যদি ছোটকে সালাম করে, তবে তাহা বড়র পক্ষে অন্যায় নহে, বরং বড়র পক্ষে তাহা সৌজন্য; কিন্তু ছোটর কর্তব্য যে, ছোটই বড়কে আগে নম্রভাবে সালাম করিবে। কিছু দীর্ঘকাল পরে মোলাকাত হইলে সালামের পর মোছাফাহাও করা উচিত। মোছাফাহা দুই হাত দিয়া করা বেশী নম্রতাব্যঞ্জক, এক হাত দিয়া মোছাফাহা করা যায়। মোছাফাহার সময় উভয়ে বলিবে— يَغْفِرُ اللّٰهُ لِىْ وَلَكُمْ 'আল্লাহ্ আমার গোনাহ্ মাফ করিয়া দিন, আপনার গোনাহ্ও মাফ করিয়া দিন।' দীর্ঘ দিন পরে মোলাকাত হইলে সালাম ও মোছাফাহার সঙ্গে মোয়ানাকাও করা যাইতে পারে। কিন্তু সালাম, মোছাফাহা, হাসি-আলাপ বিনিময় যেমন স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে হইতে পারিবে না—নিষিদ্ধ; তেমন যদি স্বামী-স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কোন যুবক দুইজনের মধ্যে মোয়ানাকা অর্থাৎ কোলাকুলি করিলে উত্তেজনার আশঙ্কা থাকে, তবে এমন দুইজনের মধ্যে মোয়ানাকা হওয়া চাই না। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জোড় হাত করিয়া বা মাথা নত করিয়া বা মাথা মাটিতে রাখিয়া সেবা, নমস্কার বা প্রণামপ্রণিপাত করার প্রথা আছে—ইহা মানুষের সামনে মানুষের দাসত্বব্যঞ্জক এবং শির্‌কব্যঞ্জক জঘন্য প্রথা। সালাম বলার সময় জোড় হাত করার বা মাথা নত করার আদৌ আবশ্যক নাই। অবশ্য শব্দ না শুনা গেলে বা শুনা না যাইবার আশঙ্কা থাকিলে অথবা স্বাভাবিক আদব ও নম্রতা

প্রকাশের জন্য মূল বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে হাতের দ্বারা বা মাথার দ্বারা ইশারাও করা যাইতে পারে এবং মা-বাপ ও ওস্তাদ, পীরের বা স্বামীর, শ্বশুরের প্রতি গাঢ় ভক্তি ও মহব্বত প্রদর্শের জন্য পদ-চুম্বন বা হস্তচুম্বন করিতে চাহিলে তাহাও করা যাইতে পারে। পদ চুম্বনের বেলায় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন মাথা রুকূর মত বা সজ্‌দার মত নত না হয়; এর জন্য হাতের দ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া হাতে চুমা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রথা চালুকরণের যোগ্য প্রথা নহে। আসল সুন্নত, ইসলামী আদর্শ সালাম-মোছাফাহা পর্যন্ত, বা বুযুর্গ লোকেরা বাচ্চাদের মাথায় হাত ফিরাইয়া দেওয়া পর্যন্ত। কোন কোন সমাজে "গুডমর্ণিং" বলিয়া সালাম করার প্রথা আছে; ইহা শিরকমূলক নয় বটে, কিন্তু নাস্তিকতাব্যঞ্জক। ইহার অনুকরণে আরব দেশে اصباح الخير বলার প্রথা চালু হইতেছে। ইহা অজ্ঞাতসারে নাস্তিকতার অনুপ্রবেশ। ইসলামের আদর্শের ন্যায় সর্বদিক রক্ষাকারী সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ আর নাই।

জামাআতি নেযাম

স্বদেশে, বিদেশে, গ্রামে, শহরে যে কোন স্থানে কমপক্ষে তিনজন মুসলমান থাকিলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর জামাআতি নেযাম—অর্থাৎ একতা শৃঙ্খলা থাকার বিধান ও নির্দেশ শরীঅতে আছে। তিনজন হউক বা ততোধিক হউক, তাহাদের একজনকে ইমাম অর্থাৎ নেতা ও মুরুব্বি নির্বাচন করিয়া লওয়া কর্তব্য। নির্বাচন এল্‌ম ও তাকওয়ার গুণের মাপকাঠিতে হওয়া উচিত। অর্থ, বংশ বা বর্ণের দিক দিয়া হওয়া উচিত নয়। যাহাকে ইমাম, নেতা বা মুরুব্বি নির্বাচিত করা হইবে, তাঁহার দায়িত্ব হইবে—জামাআতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করা। জামাআতের দায়িত্ব হইবে নেতার অনুমতি লইয়া অন্যত্র যাওয়া এবং কাজ করা। আর কাজ করিয়া নেতাকে এত্তেলা বা খবর দেওয়া। এই নেযাম, এই আদর্শ (নিয়ম) আজ মুসলমান সমাজে প্রতিপালিত হয় না বলিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা আসিয়া গিয়াছে। বিশৃঙ্খলার পরিণতি দুর্বলতা। এই বিশৃঙ্খলা এবং এই দুর্বলতা দূর করিতে হইবে।

অন্যান্য খণ্ডের অনুবাদের কালে আমি খুব কম পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়াই শুধু মাসআলাগুলি সাজানের মধ্যে কিছু তরতীব বদলাইয়া দিয়াছি। কিন্তু ষষ্ঠ খণ্ড যেহেতু লিখিত হইয়াছিল যে দেশের এবং যে কালের সামাজিক কু-প্রথা সংশোধনের জন্য; সে দেশ এবং সে কাল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, কু-প্রথাও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই আমি নগণ্য খাদেম স্বয়ং মোছান্নেফ আল্লামার সংসর্গে ২২ বৎসর কাল এল্‌ম দুরুস্ত ও পোখতা করার উদ্দেশ্যে থাকার ফলে যাহাকিছু কোরআন-হাদীসের আলো এবং এল্‌ম ও মা'রেফাৎ তাঁহার পদধূলির বরকতে আল্লাহ্ পাক এই নগণ্য দাসকে দান করিয়াছেন, তাহার আলোতে এই খণ্ডকে বলিতে গেলে অতি অল্প মাত্রায় তাঁহার লেখা বাকী রাখিয়া অবশিষ্ট সবটুকু তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরিবর্তন করিয়া লেখা হইয়াছে। কোন বিজ্ঞ আলেম ভাই দলিলের দিক দিয়া কোন ভুল পাইলে সে ভুল আমার হইবে, মোছান্নেফ আল্লামার নহে। আমাকে আমার জীবিত অবস্থায় জানাইলে ভুল সংশোধন করিয়া দিব। আমার মৃত্যুর পর কোরআন-হাদীসে মাহের (পারদর্শী) আলেমগণের কোরআন-হাদীসের আলোতে, কোরআন হাদীসের মাপকাঠিতে মাপিয়া সংশোধন এবং সমালোচনা করার অধিকার হামেশা থাকিবে।

নাচীয—**শামছুল হক**

বেহ্তরীন জেহীয

ভূমিকা

হযরত থানভী (রঃ) কর্তৃক লিখিত

অনুবাদঃ মাওলানা আবদুল মজীদ

এছলাহুন্নেছা নামক রেছালা প্রণয়নকালে স্ত্রীলোকদের জন্য অতি উপকারী একটি প্রবন্ধ পুরাকাজী নিবাসী, তেলাম রাজ্যের উকীল, মাদ্রাছায়ে আলীয়া দেওবন্দের সদ্যস্য হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব কর্তৃক লিখিত আমার দৃষ্টিগোচর হয়। তদীয় পুত্র মাওলানা নজরুল হক ছাহেবের বর্ণনা মতে প্রবন্ধ লেখার মূল উদ্দেশ্যঃ মাওলানা আবদুল হক ছাহেবের প্রিয়তম কন্যা আসআদী বেগমের শরীঅত অনুযায়ী বিবাহের পর বিদায়কালে এই প্রবন্ধখানা সঙ্গে দিয়াছিলেন যেন এই হেদায়ত অনুযায়ী আমল করিয়া দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতে নাজাত পাইতে পারে। তাহার একটি কপি প্রকাশ করার অনুমতিপত্রসহ আমাকে দেওয়া হয়। এদিকে এছলাহুন্নেছা রেসালাখানা ছাপা হইয়া প্রেস হইতে বাহির হইতেছিল, তখন ঐ রেসালার পরিশিষ্ট হিসাবে এই প্রবন্ধখানা সংযোজিত করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে হইল। প্রবন্ধের মধ্যে গুটিকয়েক বাক্য ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করিয়া লেখা। বাকী অংশ সবটুকুই সর্বসাধারণের প্রতি একান্তভাবে প্রযোজ্য। মাওলানা ছাহেব প্রবন্ধখানার নাম রাখিয়াছেন "বেহ্তরীন জেহীয"। দো'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা যেন ইহাকে সকলের জন্য উপকারী এবং সমাজ হইতে মূর্খতা দূরীভূতকারী বানাইয়া দেন।

আহ্কার আশরাফ আলী

৩রা রবিউস্সানী

১৩৩০ হিজরী

الحمد لله

বেহ্তরীন জেহীয

সর্বপ্রথম করুণাময় আল্লাহ্র প্রশংসা ও পাক নবীর উপর শত সহস্র দরূদ।

আমার স্নেহাস্পদ কন্যা, হৃদয়ের টুকরা! তোমার (আসআদী বেগম) নামানুসারে আল্লাহ্ তোমাকে উভয় জগতে সৌভাগ্যবতী ও নেকবখ্ত বানান; এই আন্তরিক মোনাজাত।

এযাবৎ তুমি মায়ের স্নেহ-মমতায় এবং দয়ালু পিতার সুকোমল ছায়াতলে প্রতিপালিত হইয়াছ। তোমার সুখ-শান্তিই ছিল তোমার পিতামাতার কাছে সর্বাধিক অগ্রগণ্য। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, তোমার চারিত্রিক সংশোধন ও উন্নতির একমাত্র জিম্মাদার ও দায়ী ছিলেন তোমার পিতামাতা।

আজ হইতে তুমি একটি নতুন সংসারে পা দিয়াছ, যেখানে তোমার যাবতীয় স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী। অতএব, আমি তোমাকে কয়েকটি উপদেশ দিতেছি। যদি তুমি উহা পুরাপুরি আমল কর, তবে ইনশাআল্লাহ্ দ্বীন ও দুনিয়ায় তুমি সফলকাম হইবে।

হেদায়ত ও নছীহতসমূহ

তওহীদ ও রেসালতঃ

যাবতীয় কাজের মধ্যে আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়রবীর স্থান সর্বাগ্রে; কাজেই এ কথাটি সদাসর্বদা অন্তরে জাগরুক রাখিবে। আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীত (খেলাফ) কেহ যদি কোন কাজ করিতে বলে, আদেশকারী যে কেহই হউক না কেন, কিছুতেই তাহা মানিও না। দেখ, আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদে মা-বাপের তাবেদারী করিতে খুব বেশী তাকীদ করিয়াছেন। এমন কি, হাদীসে বলা হইয়াছে, "সন্তানের বেহেশ্‌ত মা-বাপের পদতলে"—(হাদীস)। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যদি মা-বাপও কোন আদেশ করেন, তাহাও মানিও না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামে পাকে ফরমাইয়াছেনঃ

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ○

তর্জমাঃ তোমার মা-বাপ যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কোন কিছুর শরীক করিতে বল প্রয়োগ করে—যাহা তোমার জানা নাই, তবে তুমি তাহাদের ঐ হুকুম পালন করিও না। অবশ্য পার্থিব ব্যাপারে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে থাক। আমি যে তোমার জন্য "চল্লিশ হাদীস" পুস্তিকা সংকলন করিয়াছি এবং তুমি উহা তর্জমা সহকারে মুখস্থও করিয়াছ, উহাতে এই হাদীসটি আছেঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ○

"যে কাজে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নাফরমানী প্রকাশ পায়, সেই কাজে কোন মানুষেরই হুকুম মান্য করা চলিবে না। অতএব, তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যখন একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ধারণা বদ্ধমূল থাকিবে, তখন তুমি আপনা হইতেই আল্লাহ্‌র আদেশসমূহের পাবন্দ থাকিবে। শরীঅতের আদেশ এবং আল্লাহ্‌র হুকুম অনেক আছে, যাহা তুমি অল্প-বিস্তর দ্বীনি পুস্তকে বিশেষতঃ বেহেশ্‌তী জেওরে পড়িয়াছ। এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য তন্মধ্যে যেগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, অতি সংক্ষেপে সেগুলি বর্ণিত হইতেছে।

নামাযঃ

আল্লাহ্‌র একত্ব এবং রাসূলের রেসালতের প্রতি মনের অটল বিশ্বাস স্থাপনের পর যে বিষয় সম্বন্ধে কোরআন শরীফে অতি গুরুত্ব সহকারে স্থানে স্থানে তাকীদ আসিয়াছে; তাহা হইল নামায। ইহা ইসলামের এমন সুদৃঢ় স্তম্ভ এবং অপরিহার্য ফরয যে, কোন আকেল-বালেগের জন্য উহা হইতে অব্যাহতি নাই। বাড়ীতেই থাক আর সফরেই যাও, রীতিমত নামায আদায় করিবে। অধিকাংশ মেয়েলোক নামাযের পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও সফরে নামাযের বেশী খেয়াল ও লক্ষ্য রাখে না। এদিকে তুমি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিও।

জাহাজ বা গাড়ীর সফরে নামায ঃ

সফরেও যেন তোমার নামায ক্বাযা হইতে না পারে। রেলগাড়ীতেই সফর কর কিংবা গরুর গাড়ীতে। গরুর গাড়ী তো তোমারই আয়ত্তে। মাঠে থামাও এবং এক পাশে গিয়া বোরখা পরিয়া অথবা বড় একটি চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িয়া লও। যদি ওযূ না থাকে, তবে গরুর গাড়ীর আড়ালে বসিয়া ওযূ করিয়া লও, আর যদি রেলগাড়ীতে সফর কর, তবে মেয়েদের নির্ধারিত গাড়ীতে সফর করিও; সেই গাড়ীতে যত ভিড়ই হউক না কেন, নামায পড়িবার পাক্কা এরাদা (দৃঢ়) থাকিলে নামাযের জায়গা নিশ্চয়ই পাইবে। অনেক ষ্টেশনে রেলগাড়ী এতটুকু দাঁড়ায় যে, দুই তিন রাকা'আত নামায পড়া যায়। কেননা, শরয়ী সফরে নামায হয়ত দুই রাকা'আত, নচেৎ তিন রাকা'আত, এতটুকু অবসর অবশ্যই পাওয়া যায়। শরয়ী সফরে সুন্নত ও নফল পড়িতে না পারিলে তত বেশী দোষ নাই। কিন্তু ফরয ওয়াজিব সফরেও ছাড়িও না। আর যদি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত গাড়ীতে আরোহণ না করিয়া থাক, তবে তোমার স্বামী কিংবা তোমার মাহরাম আত্মীয় হয়ত নিকটেই বসা থাকিবে। সে নিশ্চয়ই তোমার কাজের জিম্মাদার। মোটকথা, অটল ও দৃঢ় ইচ্ছার সম্মুখে কোন বাধা নাই। পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, যে নেহায়ত দৃঢ়তার সহিত নামাযের পাবন্দ, সে সফরেও নামায যেরূপেই পারে পড়িয়া লইবে। রেলগাড়ী যদিও নিজের আয়ত্তে নহে, কিন্তু নামায ক্বাযা করিবার জন্য ইহা ওযর নহে। আমি খুব সন্তুষ্ট যে, তুমি খুব ধীরে সুস্থে নামাযের আরকান পূর্ণরূপে আদায় কর। আমি দো'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নেক কাজের আরও অধিক তৌফিক দান করুন। ফরযের সাথে সাথে সুন্নতে মোআক্কাদারও পাবন্দ থাকিও। সম্ভব হইলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নত নফল পড়িও।

তাহাজ্জুদের নামায ঃ

তাহাজ্জুদের নামাযে বহুত বড় সওয়াব। আমাদের রাসূলুল্ললাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়াছেন। কোন সময় রাত্রে পড়িবার সুযোগ না পাইয়া থাকিলে দিনের বেলায় পড়িয়াছেন। তাঁহার পবিত্র বিবিগণও তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। তাহাজ্জুদের সময় দো'আ কবূল এবং রহ্মত নাযিল হয়।

কোরআন তেলাওয়াত ঃ

কোন এক নামাযের পর কোরআন মজীদ তেলাওয়াতও করিও। ফজরের নামাযের পর তেলাওয়াতের সময় নির্ধারিত করা খুবই উত্তম। তুমি কোরআন শরীফ তর্জমাসহ পড়িয়াছ। কাজেই তেলাওয়াতের সময় তর্জমার প্রতি খেয়াল রাখিও, যেখানে বুঝে না আসে জিজ্ঞাসা করিয়া লইও। ইহা অত্যন্ত খুশীর বিষয় যে, তুমি কোরআন শরীফ পড়ার সময় প্রত্যেকটি হরফ তাহার নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচ্চারণ কর। আ'ইন, 'হা-হোত্তী' ইহাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অধিকাংশ মেয়েলোকের কোরআন শরীফ পড়ার মধ্যে দেখা যায় যে, মাখরাজ হইতে তাহাদের হরফ উচ্চারিত হয় না, "হা-হোত্তী"র স্থলে "হা-হাওয়ায" এবং 'আইনে'র স্থলে আলেফ অর্থাৎ হামযা বাহির হয়।

রোযা ঃ

রোযার বিষয়ে তোমাকে তাকীদ করার প্রয়োজন নাই। কেননা, নিজেই রমযান শরীফ ব্যতীত অন্যান্য নফল রোযাও রাখিয়া থাক। যেমন অন্যান্য মেয়েদেরও এইরূপ অভ্যাস। বিশেষ করিয়া রোযার ব্যাপারে মেয়েদের সাহস পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী; তবুও এতটুকু বলার প্রয়োজন

মনে করি যে, রোযাকে পাক ছাফ রাখিবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় গীবত বা পরনিন্দা হইতে বাঁচিয়া থাকা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, গীবত অতি বড় কবীরা গোনাহ্। এবিষয়ে কোরআন শরীফ এবং হাদীসে কঠোরভাবে ভীতি ও ধমকীর উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ রোযার মধ্যে অনেক বেশী খেয়াল রাখিবে যেন কাহারও গীবত না কর। গীবত করিলে রোযার ছওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এমন রোযার কোন পরওয়া করেন না, যে রোযায় মানুষ মিথ্যা এবং গীবতে লিপ্ত থাকে।

যাকাত ঃ

যাকাত ফরয। তাহার শর্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ এবং সোনা-চান্দির নেছাবের পরিমাণ এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ বিবরণ যাহা কোরআনে উল্লেখ আছে, সবই তোমার জানা আছে। উহার পুনরাবৃত্তির এখানে প্রয়োজন নাই। এখানে শুধু এতটুকু বলার বিষয় যে, অধিকাংশ মেয়েলোক যাকাত সম্পর্কে বেপরোয়া থাকে। প্রথমতঃ, ধনসম্পদ একটি প্রিয় বস্তু। স্বভাবতঃই অন্তর উহাকে পৃথক করিতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ অলসতা এবং উদাসীনতার দরুন যাকাত পরিশোধ করা হয় না, যাকাত আদায় করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যেসব অলংকার আমি তোমাকে দিয়াছি, তাহা নেছাব পরিমাণ হইবে। সদাসর্বদা উহার যাকাত আদায় করিও, যদি স্বামী স্ত্রীর পক্ষ হইতে যাকাত দেয়, তাহাও জায়েয। যদি কোন স্ত্রীলোক নিজের মালের যাকাত নিজস্ব সম্পত্তি হইতে আদায় করে কিন্তু স্বামী নিষেধ করে, তবে স্বামীর কথা মান্য করা চলিবে না, যেরূপ উপরে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে— لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

এই মাসআলা শুধু তোমাকে জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যে লিখিলাম। নতুবা খোদা চাহে ত কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে না; বরং শরীঅতের অন্যান্য মাসআলা ও ফরযসমূহের পাবন্দির তাকীদ আরো বেশী পরিমাণে করা হইবে। এখানে সুবিধার জন্য দশ টাকা হইতে এক হাজার টাকা পর্যন্ত কত টাকায় কত পরিমাণ যাকাত দিতে হয় তাহার একটা তালিকা লিখিয়া দিতেছি ঃ

টাকার পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
টাকা ১০০০·০০	টাকা ২৫·০০
টাকা ৯০০·০০	টাকা ২২·৫০
টাকা ৮০০·০০	টাকা ২০·০০
টাকা ৭০০·০০	টাকা ১৭·৫০
টাকা ৬০০·০০	টাকা ১৫·০০
টাকা ৫০০·০০	টাকা ১২·৫০
টাকা ৪০০·০০	টাকা ১০·০০
টাকা ৩০০·০০	টাকা ৭·৫০
টাকা ২০০·০০	টাকা ৫·০০
টাকা ১০০·০০	টাকা ২·৫০
টাকা ৫০·০০	টাকা ১·২৫
টাকা ২৫·০০	টাকা ·৬২
টাকা ২০·০০	টাকা ·৫০
টাকা ১০·০০	টাকা ·২৫

উপরোক্ত তালিকা দ্বারা মধ্যবর্তী অংকের যাকাত বাহির করাও সহজ হইবে। যেমন ১৫০ (দেড়শত) টাকার যাকাত জানিতে চাহিলে তালিকা হইতে ১০০ টাকার যাকাত দেখ, অতঃপর ৫০ টাকার যাকাত দেখ, একত্রে যাকাতের উভয় সংখ্যা যোগ দাও, দেড়শত টাকার যাকাত বুঝে আসিবে। তদ্রূপ ৭৫ টাকার যাকাত জানিতে চাহিলে পঞ্চাশ এবং পঁচিশ টাকার যাকাত যোগ দাও, ৭৫ টাকার যাকাত বুঝে আসিবে।

হজ্জ ঃ

হজ্জ করিবার মত সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ ফরয হয়। যাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে অথচ হজ্জ করে না, এমন লোকের প্রতি হাদীসে কঠোর ধমকি ও তাম্বীহ উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির প্রতি অমুসলমান হইয়া মরিবার ধমকি দিয়াছেন। আমার জানা আছে, যে পরিমাণ অলংকারাদিতে হজ্জ ফরয হয়, সেই পরিমাণ অলংকার তোমার কাছে নাই। মেয়েলোকের কাছে শুধু রাহা খরচ থাকিলে হজ্জ ফরয হয় না। বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত আসা যাওয়া, খাওয়া খরচ ব্যতীত সঙ্গে মাহরাম ব্যক্তি বা স্বামী থাকাও শর্ত। এই মাসআলা তুমি দ্বীনি রেসালায় পড়িয়াছ। আল্লাহ্ যদি তোমাকে হজ্জ করার মত তৌফিক দেন, তবে তুমি ইতস্ততঃ না করিয়া হজ্জ আদায় করিবে।

পতিভক্তি ঃ

এখন তোমার কর্মজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করিব। স্ত্রীর উপর স্বামীর আদেশ পালন ফরয। হাদীস শরীফে ইহার বহুত তাকীদ আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি আমি কোন মানুষকে সজ্দা করার আদেশ করিতাম, তবে রমণীদিগকে আদেশ করিতাম যে, তাহারা যেন নিজ নিজ স্বামীকে সজ্দা করে। কিন্তু আমাদের শরীঅতে যেহেতু তাযীমী সজ্দা হারাম, এই জন্য রাসূল্লাল্লাহ্ (দঃ) কাহাকেও সজ্দা করার অনুমতি দেন নাই। অত্র হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খেয়াল করা দরকার যে, শরীঅতে স্বামীর ফরমাঁবরদারীর আদেশ কত তাকীদ সহকারে করা হইয়াছে। যে নারী স্বামীর নাফরমান এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, এমন নারী আল্লাহ্র রহ্মত হইতে বহু দূর থাকিবে, যতক্ষণ সে তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট না করিবে। স্মরণ রাখিবে, যদি কোন স্বামী ফরয কাজ সমাধা করিলে নারায হয় তবে তৎপ্রতি পরওয়া করিবে না। কেননা لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ, আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কাহারও ফরমাঁবরদারী চলে না। এই হাদীসখানা কয়েকবার বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানেও শুধু স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য লিখিত হইল। নচেৎ খোদা চাহে ত, এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন তুমি হইবে না। যেই রমণীর মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকিবে, সেই নারীর প্রতি তাহার স্বামী কখনও অসন্তুষ্ট হইবে না। শেখ সাদী (রঃ) বোস্তাঁর একটি বয়াতে গুণ তিনটি একস্থানে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

زن خوب وفرماں بروپارسا کند مرد درویش راپادشاه

অর্থাৎ, *'সুশ্রী' তাবেদার ও দ্বীনদার নারী,*
দরিদ্র স্বামীকে করে রাজ্যের অধিকারী।'

শেষোক্ত গুণ দুইটি মানুষের আয়ত্তে। যদি কোন রমণীর মধ্যে প্রথমোক্ত গুণটি নাও থাকে, তবে শেষোক্ত গুণ দুইটি বিদ্যমান থাকিলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুমধুর ও সুখময় হইবে। আর যদি প্রথমোক্ত গুণটি বিদ্যমান থাকা সত্বেও শেষোক্ত গুণ দুইটি বিদ্যমান না থাকে, তবে এমন নারী

দুনিয়াতেও বদনামের ভাগী এবং পরকালে তাহার জন্য কঠোর আযাব রহিয়াছে। যে স্ত্রীলোক স্বামীর তাবেদার না হয়, কিংবা বদমেযাজ হয়, কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে, সেই নারী সম্পর্কেও শেখ সাদী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

زن بد درسرائے مرد نیکو   همدرین عالم است دوزخ او

অর্থাৎ, *‘নেক্‌কার স্বামী গৃহে নারী বদকার*
দোযখ দেখিবে এই বিশ্বের মাঝার।’

বাস্তব সত্য কথা এই যে, যেই সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুখের না হয়, সেই সংসার জাহান্নাম সদৃশ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের প্রতি লোকেরা হাসাহাসি করে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবন-যাত্রা দুর্বিষহ হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে আমি এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আর যেই সংসারে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সুমধুর, সেই সংসার যদিও দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের হয়, তবুও উহা ধন-ভাণ্ডার ও শাহী মহল হইতে শতগুণে উত্তম; বরং উহা বেহেশ্‌তের নমুনায় রূপায়িত হইয়া যায়।

কোন কোন সময় ইহাও সম্ভব যে, তোমার ধারণা মতে স্বামীর অসন্তুষ্টি একেবারেই অকারণ এবং এমনও হইতে পারে যে, বাস্তবে তোমার ধারণাই সত্য; এমতাবস্থায়ও অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত সহ্য করিবে। এমনকি, তোমার কথায় তো দূরের কথা, ইশারা-ইঙ্গিতেও যেন প্রকাশ না পায় যে, তাহার ক্রোধ করা অন্যায় এবং রাগ করা অমূলক ছিল। তোমার এই ধৈর্য অবশেষে এক দিন তাহাকে অবহিত করিবে যে, তাহার এই রাগ অকারণে ছিল। ইহার পরিণতি অতীব শুভ এবং তোমার প্রতি অত্যধিক দয়া ও মেহেরবানীর কারণ হইবে। এরূপ ব্যবহারে তো শত্রুও মিত্র হয়; আর স্বামী তো স্বামীই। অবশ্য এই ধৈর্য ধারণকালে এদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখিও যেন, তোমার চোখ ভ্রূ-কুঞ্চিত না হয়; বরং প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকিবে। কথাবার্তায় চালচলনে কিছুতেই যেন অসন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়া না উঠে। স্বামীর সহিত কথাবার্তা বলার সময় তাঁহার মর্যাদার ও মর্তবার প্রতি খুব খেয়াল রাখিও। মনখোলা কথাবার্তা বলার সময়ও এদিকে লক্ষ্য রাখিও। সম্বোধনে এমন শব্দ কিছুতেই ব্যবহার করিও না, যদ্দ্বারা বেআদবি বুঝে আসে। স্বামী কোন কথা বলিলে প্রথমে খুব মন দিয়া শুন, তারপর আদব সহকারে যথাযথ উত্তর দাও। উত্তর অতি উচ্চস্বরেও দিও না, আবার এত নিম্নস্বরেও দিও না যে, আওয়ায শুনা না যায়। স্বামী যদি কোন ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হন কিংবা ভুল বুঝিয়া থাকেন, তবে ঐ ঘটনা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি অতি আদব ও ভক্তি সহকারে খণ্ডন করিতে চেষ্টা কর। এমন শব্দ প্রয়োগ করিও না যাহাতে স্বামীর প্রতি ঐ ব্যাপারে অজ্ঞতার কটাক্ষ হয়। আর যদি মানবতা সুলভ দুর্বলতার কারণে তোমার দ্বারা কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইয়া যায়, অথবা কোন কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া পড়ে, তবে উহা স্বীকার করিয়া মাফ চাহিয়া লও, ইহার ফল হইবে অতীব শুভ। স্বামীর কাছে যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় দ্বীনি মাসআলা বিষয়কই হউক কিংবা সাংসারিক কোন কথা হউক, তবে উহা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা কর এবং ভালরূপে বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হও।

درطلب کردن حقیقت کار   ازخدا شرم دار وشرم اومدار

অর্থাৎ, কোন বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা জানিবার বাসনা হইলে লজ্জা করিবে না, আল্লাহ্‌র সহিত লজ্জা করিবে, যেন গোনাহ্ না হয়।

স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতাঃ

স্ত্রীলোকের সচরাচর অভ্যাস, তাহারা স্বামীর না-শুক্‌রি করে; এই অভ্যাস অতি জঘন্য। স্বামী কিংবা শ্বশুরের পক্ষ হইতে যাহাকিছু খাদ্য-দ্রব্য পাও, উহা কৃতজ্ঞতা সহকারে কবূল করা কর্তব্য। যত সামান্য ও নগণ্যই হউক না কেন, উহার প্রতিও শোক্‌র করা ওয়াজিব। লক্ষ লক্ষ লোক এরূপ আছে যাহারা তোমার মত খাইতে বা পরিতে পায় না এবং তোমার মত আরামেও তাহারা নাই। খাওয়া, পরা, ধন-দৌলতের কোনটিরই লোভ করিও না। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, উহাতে শক্ত গোনাহ্‌ ব্যতীত মানুষ নিজে নিজেই আযাবে লিপ্ত থাকে। পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারে হামেশা নিজের চেয়ে হীন অবস্থাসম্পন্নদের প্রতি দৃষ্টি রাখ এবং দ্বীনের কাজে সব সময় যাহারা তোমার উর্ধ্বে সে দিকে নজর রাখ। এরূপ করিলে তুমি দুনিয়াতে সুখী হইবে এবং নেক কাজের তৌফিক পাইবে।

শ্বশুর বাড়ীর লোকদের সহিত আচার-ব্যবহারঃ

বড়দের সহিত ব্যবহারঃ

নিজের স্নেহময়ী মাতার ন্যায় প্রত্যেক কাজে শাশুড়ীর আদব করিও এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য মনে করিও। তোমার যতই কষ্ট বা আরাম হউক না কেন, কিন্তু তাঁহার মর্জির বিপরীত এক পা-ও আগে বাড়াইও না। মুখে এমন কোন কথা উচ্চারণ করিও না, যাহাতে তাঁহার কষ্ট হয়। তাঁহার সাথে যখন কথা বল কিম্বা তাঁহাকে যখন সম্বোধন কর, তখন নিজের সমকক্ষদের সাথে যেইরূপ সম্বোধন কর সেইরূপ করিও না; বরং মুরব্বীদের জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা উচিত তাহাই ব্যবহার কর। তোমার শাশুড়ী যদি কোন কাজে তোমাকে তাম্বীহ্‌ করেন, তবে উহা নীরবে শুন; যদিও মনের বিপরীত এবং কটু কথাও বলেন (যাহা আশা করা যায় না), তবুও সুস্বাদু শরবতের ন্যায় অনায়াসে পান কর (সহ্য কর)। খবরদার! কস্মিনকালেও কঠোরভাবে প্রতি-উত্তর করিও না। নিজের মায়ের সমতুল্য তাঁহার খেদমত কর। তিনি যদি অন্য কাহাকেও কোন কাজের আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ সে কাজ তুমি নিজেই করিয়া ফেল। মেহেরবান পিতার ন্যায় শ্বশুরের তা'যীম ও শ্রদ্ধা কর। শাশুড়ীর সহিত কথা-বার্তা বলার যে আদব কায়দা লিখিয়াছি, শ্বশুরের বেলায়ও সে দিকে লক্ষ্য রাখ। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, "তোমার শ্বশুর কোথায় গেছেন?" তদুত্তরে বল যে, "অমুক স্থানে তশরীফ নিয়া গেছেন।" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "অমুক বিষয়ে তোমার শ্বশুর কি বলিয়াছেন?" তদুত্তরে তুমি বল যে "তিনি এরূপ ফরমাইয়াছেন।" তাঁহাকে আরাম পৌঁছানের এবং তাঁহার খেদমতের যথাসাধ্য চেষ্টা কর। কোন উৎসবে যোগদান করিতে হইলে কিংবা কোন বান্ধবীর সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে নিজের শ্বশুর ও স্বামীর নিকট হইতে অনুমতি লও। তাঁহারা যদি উপস্থিত না থাকেন, তবে শাশুড়ীর কাছে অনুমতি চাও। যদি অনুমতি দেন, তবে যাও, নতুবা যাইও না। যদি কোন উৎসবে যাইতে বলেন, তোমার মন না চাহিলেও যাও। কেননা, খোদা না করুন ইহা সম্ভব নহে যে, তোমাকে এমন স্থানে যাইতে বলিবেন, যেখানে শরীঅত বিরোধী কোন কাজ হয়। যে বাড়ীতে বা মজলিসে শরীঅত বিরোধী কাজ হয়, তথায় যাওয়া নিষেধ।

শ্বশুর বাড়ীর কোন মহিলা যদি বয়সে তোমার চেয়ে বড় হয়, যেমন স্বামীর বড় ভাইর বিবি; তাঁহার সহিত কথাবার্তা উঠা-বসায় তাঁহার মর্তবার প্রতি লক্ষ্য রাখিও এবং তাঁহার সহিত দুধ-মিশ্রির মত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও যেন উভয়ে সহোদরা ভগ্নীদ্বয়, একজন বড়

ও একজন ছোট। যদি তুমি এমন ব্যবহার কর, তবে অপর পক্ষও তোমার সাথে এইরূপই ব্যবহার করিবে। আর যদি সে বয়সে ও মর্তবায় তোমার চেয়ে ছোট হয়, তবে তাহার সাথে স্নেহ ও মহব্বত সুলভ ব্যবহার কর এবং তাহাকে অতি নম্র ও শান্তভাবে ভাল ভাল কথা শিক্ষা দিতে থাক। সে কোন কাজ করিতে আরম্ভ করিলে তুমি নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহার সহায়ক হইয়া ঐ কাজ সমাধা কর। অনুরূপ স্বামীর ভগ্নী, ভাগিনী ইত্যাদির সহিত যার যার মর্তবা অনুযায়ী সম্ভ্রম ও নম্র ব্যবহার কর, কিন্তু ইহাতেও মধ্যপন্থার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখিও। কেননা, মধ্যপন্থায় অতীব নম্রতা ও সম্ভ্রম ব্যবহার সদাসর্বদা রক্ষা করিয়া চলা সু-কঠিন। নিজের বাড়ীতে বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষে যখন মেয়েদের সহিত একত্রিত হও, তখন কাহারও সম্পর্কে তাহার অগোচরে এমন কোন কথা বলিও না যে, এই কথা তাহার কর্ণগোচর হইলে সে ইহা খারাব মনে করিবে; ইহাকেই গীবত বলে। গীবত করার গোনাহ্ অতি কঠোর। ইহা সম্পর্কে আগেও আমি রোযার বয়ানে কিছু বর্ণনা করিয়াছি। এখানে এই কথাটা শুধু উল্লেখযোগ্য যে, কেহ্ কেহ্ বলিয়া থাকে যে, আমি তো কোন মিছা কথা বলিতেছি না; যাহা বলিতেছি, তাহা তো অমুকের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

স্মরণ রাখিও, ইহা নফ্‌সের একটি ধোঁকা। কাহারও কোন দোষ বর্ণনা করিলে যদি সে দোষ তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবেই তো উহাকে গীবত বলে, বাস্তব দোষ বর্ণনার নামই গীবত। আর যদি ঐ দোষ তাহার মধ্যে না থাকে, তবে তো দ্বিগুণ গোনাহ্ হয়। এই প্রকার গীবতের নাম তোহ্‌মত।

ছোটদের প্রতি ব্যবহারঃ

বাড়ীতে যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তোমার শ্বশুরেরই হউক বা বাড়ীতে অবস্থানকারী অন্য কোন আত্মীয়েরই হউক, তাহাদের সাথে অতিশয় স্নেহমমতা সুলভ ব্যবহার কর।

হাদীস শরীফে আছেঃ

عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْكَبِيْرَنَا – رواه ترمذى مشكوة

‘যে ব্যক্তি বড়দের আদব করে না ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।’ আমাদের রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদিগকে বড় ভালবাসিতেন। এমনকি একবার একটি ছোট শিশু তাঁহার কোলে পেশাবও করিয়াছিল। —মেশকাত

কোন কোন স্ত্রীলোক যাহারা শিশুদিগকে স্নেহ করে, তাহারা ছেলেপিলেকে কাছে আসিবার জন্য এই বাহানা করিয়া ডাকে যে, আস, আমি তোমাকে একটি বস্তু দিব, অথচ কিছু দেওয়ার ইচ্ছা নাই। শুধু ডাকিয়া আনাই উদ্দেশ্য; কিন্তু এরূপ বলা এক প্রকার মিথ্যা। কখনও এরূপ করিও না।

একদা রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একজন স্ত্রীলোক শিশুকে কিছু দিবে বলিয়া ডাকিল, কিন্তু সে মিছামিছি প্ররোচনা দেয় নাই; বরং শিশুকে কোন কিছু দিয়াছিল। রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি ইহাকে কিছু না দিতে, তবে মিথ্যা হইত। —আবু দাউদ, বায়হাকী

চাকর চাকরাণীর সহিত ব্যবহার ঃ

বাড়ীতে যদি কান চাকরাণী থাকে, তবে তাহার দ্বারা তাহার সাধ্যাতীত কাজ লইও না। কোন কাজ তাহার কষ্টসাধ্য হইলে ঐ কাজে নিজের সহায়তা করা কর্তব্য। তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিও না। সে রোগাক্রান্ত হইলে কিংবা কোন কষ্টে পতিত হইলে তাহাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিও । চাকরাণীদের সাথে তোমার মাতার ব্যবহার তুমি দেখিয়াছ। কোন চাকরাণীর মাথায় একটু ব্যথা অনুভব হইলে কাজের ফরমাইশ তাহাকে না দিয়া তোমার মা নিজেই সেই কাজ করিয়াছে। অবশ্য এরূপও করা চাই না, যাহতে চাকর-চাকরাণীরা একেবারে আরামপ্রিয় ও কামচোরা হইয়া যায়। চাকরাণীদেরকে নিষ্কর্মা করিয়া রাখা বাস্তবে ইহা তাহাদের সহিত শত্রুতা করা। কেননা, সে অন্যত্র যেখানেই যাইবে, সর্বদা গৃহকর্ত্রীর গালমন্দ শুনিবে। খাওয়া-দাওয়ার কোন উৎকৃষ্ট বস্তু তোহ্ফা স্বরূপ কোথাও হইতে আসিলে, উহা হইতে চাকরাণীদের কিছু কিছু দেওয়া উচিত। তোমার মাতার ব্যবহার তুমি নিজ চক্ষেই দেখিয়াছ যে, জিনিস যত অল্পই হউক না কেন, তবুও চাকরাণীর একটা অংশ রাখা হইত। তোমার মাতার এই আচরণ দেখিয়া মনে মনে ভারী আনন্দিত হইতাম যে, সৃষ্টিগতভাবে তোমাদের মধ্যে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণ বিদ্যমান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এই সৎগুণে আরো উন্নতি দিন। নিজ স্বামী এবং বাড়ীর অন্যান্য মেয়েলোকদের সহিত এই ব্যবহার করিতে থাকিও।

মেহ্মানদারী ঃ

যেসব মহিলা অন্দর মহলে এবং পুরুষ বহির্বাটীতে মেহ্মান হইয়া আসে, স্বামীর মর্জি অনুযায়ী উদার মনে তাহাদের মেহ্মানদারী করা কর্তব্য। মেহমানদের খাতিরে নিজেদের স্বাভাবিক খাদ্যের চেয়ে একটু জাঁকজমকপূর্ণ খানার ব্যবস্থা করা জায়েয আছে; কিন্তু অপব্যয়ের সীমায় যেন না পৌঁছে। আর যদি কোন মেহ্মান মোত্তাকী, আল্লাহ্র নেকবান্দা হয়; তবে তাহার মেহ্মানদারীকে বরকতের কারণ এবং সৌভাগ্য মনে করা চাই। যে কোন মেহ্মানই হউক না কেন, কখনও সংকীর্ণমনা হওয়া উচিত নহে। আমাদের রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরকেও মেহ্মানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যদি মেহ্মানের খাতিরদারি এবং তাহাকে আরো মেহ্মান রাখিবার জন্য আরজু বা অনুরোধ করায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মেহ্মানের ক্ষতি হয় এরূপ পীড়াপীড়ি ভাল নয়। মেহ্মান কোন দরকারী কাজের জন্য বিদায় হইতে চায়, তবে মেজবান তাঁহাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দোহাই দেওয়া অতি অন্যায়। বস্তুতঃ ইহা কিছুতেই ভাল কাজ নহে যে, বাড়ীওয়ালার আবদার ও পীড়া-পীড়িতে মেহ্মান অসন্তুষ্ট হয় ও তাঁহার ক্ষতি হয়। হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ ছাহেব গাঙ্গুহী (কুদ্দিসা ছিররুহু) এমন পীড়াপীড়ি কখনও পছন্দ করিতেন না।

মেহ্মানের খাতিরদারী, খেদমত-গোযারী যাহাকিছু করা হয়, তজ্জন্য অর্থাৎ মেহ্মানদারী করিয়া মেহ্মানের প্রতি এহ্ছান করিতেছ, কখনো একথা মনে করিও না; বরং মেহ্মানই তোমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে যে, তাহার নিজের নির্ধারিত খাদ্য তোমার এখানে আসিয়া খাইয়াছে এবং তোমাকে সওয়াবের ভাগী করিয়াছে।

شکر بجا ارکه مهمان تو   روزئےخود میخورد برخوان تو

অর্থ—শুক্রগুযারী কর যে, তোমার মেহ্মান তোমার দস্তরখানায় বসিয়া তাহার নিজের জীবিকাই খায়।

এইরূপে যদি কাহারও প্রতি কোন এহ্‌ছান করিয়া থাক, তবে কোন সময় সে এহ্‌ছান উল্লেখ করিয়া তাহার মনে আঘাত দিও না। পবিত্র কোরআন শরীফ হইতে প্রমাণিত আছে যে, এহ্‌ছান জিতাইলে (খোঁটা দিলে) সদ্ব্যবহার করার ছওয়াব বাতিল হইয়া যায়। দান-এহ্‌ছান শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া চাই।

সাধারণ আচার ব্যবহার ঃ

সংসারের কাঠামো দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য এবং উহাকে উন্নত ও ঊর্ধ্বগামী বানাইবার জন্য এবং উহার রওনক বৃদ্ধির জন্য বাটীস্থ লোকদের উপরোল্লিখিত গুণাবলী অর্থাৎ সুন্দর আচার-ব্যবহার, উৎকৃষ্ট লেনদেন, সৎস্বভাব ইত্যাদির সাথে সাথে সংসার ও গৃহস্থালীর উত্তম ব্যবস্থাপনা ও সুনিয়মতান্ত্রিক সংস্থা একটি নেহায়েত জরুরী জিনিস। সংসারের ব্যবস্থাপনা যদি যথাযথ ও সঠিক না হয়, তবে বিত্ত ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীতে কষ্ট ও অমঙ্গল নামিয়া আসিতে আমি স্বচক্ষে অনেক ধনী লোকের বাড়ীতে দেখিয়াছি।

গৃহকর্মের সুব্যবস্থা ঃ

বাড়ীর মেয়েলোকদের মধ্যে সংসারে সুব্যবস্থার যথাবিহিত নিয়ম-পদ্ধতির জ্ঞানের অভাবে তাহাদের বাড়ীর অবস্থা কপর্দকহীন কাঙ্গালদের চেয়েও নিকৃষ্ট। ঘর-সংসারের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ব্যয়ের পরিমাণ ও তাহার স্থানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে; ব্যয়ে স্থানবিশেষে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে। আয়ের চেয়ে ব্যয় যেন বেশী না হয়। আবার ব্যয়ের মাত্রা কমাইয়া কৃপণও সাজিও না। কোরআন পাকে কৃপণতা এবং অপব্যয় এতদুভয়ের দোষ ও অপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। টাকা পয়সার এতদূর মায়া মহব্বত যে, পয়সা পয়সা করিয়া জমা করার ফিকিরে পড়িয়া নিরানব্বই পাল্লায় গিয়া পড়ে। ইহা অতীব দূষণীয়। তাহা ছাড়া ইহাতে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হইয়া পড়ে। অবশ্য মধ্যবর্তিতা এমন পন্থা যে, উহাতে মানুষকে কেহ কৃপণও বলে না, অপব্যয়ীও না। প্রয়োজনের সময় তাহার কোন কাজ আটকাইয়া থাকে না। টাকা পয়সা যাহার হাতে ব্যয় হয় ব্যয়ের স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহারই কাজ। তাহার খেয়াল করা উচিত কোন্ জায়গায় কি পরিমাণ খরচ করা কর্তব্য। এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিত লেখা দুষ্কর। স্বামীর অনুমতিক্রমে যদি দৈনন্দিন খরচের হিসাব লিখিয়া রাখ এবং প্রত্যহ কিংবা সপ্তাহে একবার ঐ হিসাব স্বামীকে দেখাও, তবে ইহা খুবই স্বস্তি বিষয়ক ও আস্থার কারণ। হিসাব এমন উত্তম জিনিস যে, দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের উপকারী। ডাল, চাউল, আনাজ ইত্যাদি যাহাকিছু বাড়ীতে আসে, মাপিয়া ওজন করিয়া রাখিবে। এইরূপে টাকা-পয়সাও গণিয়া রাখিবে। কোন লোককে কর্জ দিলে কিংবা ধার লইলে তাহাও লিখিয়া রাখিবে এবং উসুল হইলে বা কর্জ শোধ করিলে তাহাও লিখিয়া রাখিবে।

এমন কি, লিখা ব্যতীত ধোপার কাছেও কাপড় দিও না। সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা এই যে, তোমার কাছে যাহাকিছু কাপড়-চোপড় টাকা-পয়সা অলংকারাদি আছে, সবই লিখিয়া রাখিবে। ইহা অত্যন্ত কাজের কথা।

ঘরের আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখা ঃ

ঘরের জিনিসপত্রগুলি স্ব স্ব স্থানে গোছাইয়া রাখাও সাংসারিক সুব্যবস্থার অন্যতম কাজ। যে জিনিস যেখানে রাখার যোগ্য তাহা সেখানে রাখাও সঙ্গত। বিছানাপত্র, চৌকি, পালঙ্ক যথাস্থানে রাখিয়া দাও। প্রয়োজনবোধে কোন জিনিস রক্ষিত স্থান হইতে বাহির করিলে পরে কাজ শেষে

আবার সেই বস্তু সেখানেই রাখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এরূপে দৈনন্দিন ব্যবহারিক থালা-বাসন এবং নিত্যপ্রয়োজীয় অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। এমন যেন না হয় যে, লোটা একস্থানে গড়াগড়ি খাইতেছে, রেকাবি অন্যস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, ডেকচি আধোয়া অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মাছির ঝাঁক বিন্‌বিন্‌ করিতেছে। এদিকে পানির কলসীর মুখ খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। কিনারে দাঁড়াইয়া কাক পানি পান করিতেছে এবং পায়খানা করিয়া নষ্ট করিতেছে।

কাপড়গুলি সব সময় ভাঁজ করিয়া রাখিও। এমন যেন না হয় যে, কাপড়-চোপড় এদিকে-ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে; যদি পশমী বা রেশমী কাপড় হয়, তবে সদাসর্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করা কর্তব্য। বিশেষতঃ বৃষ্টি-বাদলের দিনে একটু বেশী খেয়াল রাখিও। কেননা, ঐ মওছুমে কাপড়ে পোকা লাগিয়া যায়। যদিও সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে সুব্যবস্থা সুশৃংখলার শক্তি বিদ্যমান, তবুও কোশেশ ও চেষ্টার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে একথা অস্বীকার করার যো নাই। বাড়ীতে প্রতিভাবান বুদ্ধিমতী যে বেগম ছাহেবা রহিয়াছেন, সদাসর্বদা তাঁহার কাছ থেকে ঘর-সংসারের সুব্যবস্থাপনা ও শৃংখলার রীতি-নীতি শিক্ষা করিতে থাক এবং খুব লক্ষ্য করিয়া তাহার এন্তেজাম লক্ষ্য কর, অতঃপর উহার অনুসরণ কর।

এখন এই কথাগুলি শেষ করিতেছি এবং পুনরায় তোমাকে এই নছীহত করিতেছি, যদি তুমি এই হেদায়ত অনুযায়ী আমল কর, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ তুমি দোনোজাহানে সফলকাম হইবে এবং দুনিয়াতে এত সুখ-শান্তিতে বাস করিবে যে, তোমার বাড়ী বেহেশ্‌তে রূপায়িত হইবে। তোমার জন্য আমার এই নছীহতনামা বিবাহ খুশীর অতি উত্তম পিতৃদান। তুমি ইহাকে প্রতি সপ্তাহে ২/৩ বার করিয়া পড়িও ২/৩ বার সম্ভব না হইলে অন্ততঃ একবার অবশ্যই পড়িবে। আমি আল্লাহ্‌র দরগাহে কায়মনোবাক্যে দো'আ করিতেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন তোমাকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বরকত দান করেন। আমি তোমাকে শামিল করিয়া এই দো'আ করিঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থ—হে আমাদের রব্ব! দুনিয়াতে আমাদিগকে উত্তম বস্তু (এবাদত বন্দেগী হালাল রুজী ইত্যাদি) দান করুন এবং আখেরাতেও, আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

আমরা তোমার কাছে শুধু এতটুকু চাই যে, যতদিন আমরা তোমার পিতা মাতা জীবিত থাকি আমাদের জন্য ঈমানের ছালামতি এবং ঈমানের সাথে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য দো'আ করিতে থাকিবে এবং এই জাহান হইতে বিদায় হওয়ার পর আমাদিগকে দো'আয়ে মাগ্‌ফেরাতের সাথে স্মরণ করিও।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله خير الخلائق محمد

واصحابه اجمعين ـ

॥ ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

সপ্তম খণ্ড

ওযূ ইত্যাদি

১। সময় বিশেষে কিছু কষ্ট হইলেও ওযূ ভালমত করিবে।

২। নূতন ওযূ করিলে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়।

৩। পায়খানা বা পেশাব করিবার সময় কেবলার দিকে পিঠ বা মুখ দিয়া বসিও না।

৪। সাবধান থাকিও যেন পেশাবের ছিঁটা কাপড়ে বা গায়ে না লাগে ; কেননা, এ বিষয়ে সতর্ক না থাকিলে কবর আযাব হয়।

৫। কোন গর্তের মধ্যে পেশাব করিও না, হয়ত সাপ-বিচ্ছু থাকিতে পারে।

৬। গোসল করিবার জায়গায় পেশাব করিও না।

৭। পেশাব পায়খানার সময় কথা বলিও না।

৮। ঘুম হইতে উঠিয়া হাত ভালরূপে না ধুইয়া (লোটা বদনা প্রভৃতির) পানির মধ্যে হাত দিও না।

৯। রৌদ্রে থাকিয়া যে পানি গরম হইয়া গিয়াছে, সে পানি ব্যবহার করিও না, (শ্বেত কুষ্ঠ) রোগ জন্মিতে পারে।

নামায

১। নামায সময় মত পড়িবে। রুকূ, সজ্‌দা খুব ভাল করিয়া করিবে, খুব মেনোযোগ ও ভক্তির সহিত নামায পড়িবে।

২। ছেলে-মেয়ে সাত বৎসরের হইলে তাহাদের নামায পড়িতে বলিবে, দশ বৎসরের হওয়া সত্ত্বেও যদি নামায না পড়িতে চায়, তবে মারিয়া পিটিয়া নামায পড়াইবে।

৩। যে কাপড়ে বা যে জায়গায় এ রকম ফুল পাতা আঁকা আছে যে, তাহার দিকে হয়ত মন যাইতে পারে, তাহাতে নামায পড়া চাই না।

৪। খোলা ময়দানে নামায পড়িবার সময় সামনে কিছু আড় থাকা চাই ; যদি আড় কিছু না থাকে, তবে লাঠি বা অন্য কোন উঁচু জিনিস সামনে খাড়া করিয়া উহাকে ডান বা বাম ভ্রূর বরাবর রাখিয়া নামায পড়িবে।

৫। ফরয পড়িয়া সে জায়গা হইতে কিঞ্চিত সরিয়াই সুন্নত বা নফল পড়া ভাল।

৬। নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখিও না, উর্ধ্ব দিকেও নযর উঠাইও না, আর হাই আসিলে যাথাসাধ্য চাপিয়া রাখিবে।

৭। পেশাব-পায়খানার জোর থাকিলে প্রথমে পেশাব-পায়খানা শেষ করিয়া পরে নামায পড়িবে।

৮। কোন ওযীফা বা কোন নফল এবাদত শুরু করিতে হইলে যে পরিমাণ সর্বদা চালাইতে পারিবে, সেই পরিমাণ শুরু করিবে।

মৃত্যু ও বিপদের সময়

১। পুরাতন কোন কষ্টের কথা মনে উঠিলে اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁহারই কাছে আমাদিগকেও যাইতে হইবে) পড়িয়া লও, তবে যেমন ছওয়াব প্রথমে পাইয়াছ আবার সেই রকম ছওয়াব পাইবে।

২। অতি সামান্য কষ্টের কথাই হউক না কেন তাহাতেও যদি— اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়, তবে ছওয়াব পাইবে।

যাকাত খয়রাত

১। যে অভাবগ্রস্ত লোক নিজের মান-সম্মান বাঁচাইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, অন্যের দুয়ারে হাত পাতিতে লজ্জাবোধ করে, সে-সব লোকদেরই যাকাত দেওয়া উচিত।

২। অল্প বলিয়া দিতে লজ্জাবোধ করিও না, যখন যে রকম জুটে সে রকমই দান করিতে থাকিবে।

৩। অনেকে ভাবে যে, যাকাত পরিশোধ করিয়া দিলে অন্যান্য দান-খয়রাতের আর কি দরকার? এরূপ মনে করা ভুল। সুযোগ অনুসারে সাধ্যমত খয়রাত করিতে থাকা উচিত।

৪। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে দান করাতে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ হয়—(১) দান করা এক ছওয়াব, (২) আর নিজের আত্মীয়দের উপকার করা আর এক ছওয়াব।

৫। দরিদ্র প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবে।

৬। স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পত্তি হইতে এত পরিমাণ দান করা ঠিক নয়, যাহাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হইতে পারেন।

রোযা

১। রোযা রাখিয়া অযথা কথা বলিও না, কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না, আর কাহারও গীবত করা ত অতীব অন্যায় এবং গোনাহ্‌র কাজ।

২। স্বামী বাড়ী থাকিলে স্ত্রীকে নফল রোযা রাখিতে স্বামীর অনুমতি লইতে হইবে।

৩। রমযান শরীফের যখন মাত্র দশ দিন অবশিষ্ট থাকে, তখন হইতে বেশী করিয়া এবাদত করা চাই।

কাহারও সম্বন্ধে তাহার অসাক্ষাতে এমন কোন কথা বলা, যাহাতে তাহার মনে কষ্ট হয়, তাহাকে 'গীবত' বলে।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত

১। কোরআন শরীফ যদি ভালরূপে চলিয়া না পড়িতে পার, তবে বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিও না, পড়িতে থাক; এরূপ ব্যক্তিকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হয়।

২। কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাইও না, রোজ পড়িতে থাক; অন্যথায় শক্ত গোনাহ্ হইবে।

৩। কোরআন শরীফ খুব মনোযোগ ও ভক্তির সহিত পড়িবে; আর আল্লাহ্ তা’আলার ভয় ও মনে জাগরিত রাখিয়া পাঠ করিবে।

দো’আ ও যিক্‌র

১। দো’আ করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেঃ

(ক) খুব মনোযোগ ও নেহায়েত কাতর স্বরে দো’আ করিবে।

(খ) কোন গোনাহ্‌র কাজের জন্য দো’আ করিবে না।

(গ) যে কাজের জন্য দো’আ করিতেছ, তাহা পুরা হইতে দেরী হইলে বিরক্ত হইয়া দো’আ করা ছাড়িয়া দিও না।

(ঘ) দো’আ করার সময় মনে গাঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, আমার দো’আ আল্লাহ্ তা’আলা মেহেরবানী করিয়া নিশ্চয় কবূল করিবেন।

২। রাগের বশে নিজের সন্তান-সন্ততির বা ধন-সম্পত্তির জন্য বদ দো’আ করিও না। কেননা, হয়ত কবূল হইয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে পরে অনুতাপ করিবে।

৩। যেখানে বসিয়া দুনিয়ার কারবার কর বা দুনিয়ার কথাবার্তা বল, সেখানে কিছু আল্লাহ্-রাসূলের যিক্‌রও করিয়া লইবে, নতুবা ঐ সব দুনিয়াদারী বিপদের কারণ হইতে পারে।

৪। খুব বেশী করিয়া অধিকাংশ সময় এস্তেগ্‌ফার করিবে, ইহাতে অনেক মুশকিল আসান হয় এবং রুযীতে বরকত হয়।

৫। নফ্‌স বা শয়তানের ধোঁকায় দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কোন গোনাহ্ হইয়া যায়, তবে তওবা করিতে দেরী করিও না। যদি আবার ঘটনাক্রমে হইয়া পড়ে, তবে আবার তওবা করিবে। ইহা মনে করিও না যে, যখন তওবা ঠিক থাকে না, ভঙ্গ হইয়া যায় তখন আর তওবা করিয়া লাভ কি? বরং বারবার তওবা করিতে থাকিবে।

৬। অনেক দো’আ আছে যাহা বিশেষ সময়ে পড়িতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ঘুমাইবার সময় এই দো’আ পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

‘হে খোদা! তোমার নামেই আমি মৃত্যুরূপ নিদ্রায় অভিভূত হই। আবার তোমারই নামের বরকতে জীবনরূপ জাগরণ প্রাপ্ত হই।’

ঘুম হইত উঠিয়া এই দো’আ পড়িবেঃ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদের মৃত্যুর (নিদ্রাও এক প্রকার মৃত্যু) পর জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহারই কাছে সকলের যাইতে হইবে।'

সকাল বেলায় এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

আয় আল্লাহ্! আপনারই কৃপায় আমরা সকাল বেলায় জীবন ধারণ করি, আপনারই অনুগ্রহে আমরা বিকাল বেলায় জীবন ধারণ করি, আপনারই কৃপায় জীবন প্রাপ্ত হই, আপনাকে স্মরণ করিয়াই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি এবং আপনারই কাছে আবার সকলের উপস্থিত হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

অর্থ একই, কিন্তু একটা শব্দ আগে-পিছে আছে।

খানা খাইয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَفَانَا وَاٰوَانَا ـ

অর্থাৎ, 'শোক্‌র সেই আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাদের খাওয়াইয়াছেন এবং (পানি প্রভৃতি) পান করাইয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে মুসলমান করিয়াছেন এবং বিপদ-আপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং (বাস করিতে ঘর-বাড়ী দান করিয়া) আশ্রয় দান করিয়াছেন।'

ফজর এবং মাগরেবের নামাযের পর এই দো'আ সাতবার পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ, আয় আল্লাহ্! আমাকে দোযখ হইতে বাঁচাও।" এবং পরবর্তী দো'আ তিনবার পড়িবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاۤءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ, (সেই মহান) আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিয়াছি, যাঁহার নামের সঙ্গে আসমানে হউক বা জমীনে হউক, কোথাও কাহারও কোন ক্ষতি হইতে পারে না, এবং তিনি সব কথাই (আমার কাতর প্রর্থনাও) শুনেন এবং সব কিছুই (আমার হীন অবস্থাও) জানেন।

ঘোড়া বা অন্য কিছুতে চড়িতে হইলে, এই দো'আ পড়িবেঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ, 'পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি আমি সেই খোদার, যিনি আমাদের জন্য ইহাকে বশীভূত করিয়া দিয়াছেন; অথচ আমাদের ইহার উপর কোনই শক্তি ছিল না। আর আমাকে স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

কাহারও বাড়ীতে কিছু খাইলে, এ দো'আও পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ـ

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! ইহাদের যাহাকিছু (ধন-দৌলত) দান করিয়াছ, তাহাতে আরও বরকত (উন্নতি) দাও এবং তাহাদের গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও এবং তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ-দৃষ্টি কর।'

নূতন চাঁদ দেখিয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ ـ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! এই চাঁদ (মাস) ভরিয়া আমাদের শান্তি এবং ঈমানের সঙ্গে রাখিও এবং নিরাপদ ও ইসলামে মজবুত রাখিও। হে চাঁদ! (তুই ভাল-মন্দ কিছুই করিতে পারিস না,) তোর আর আমার উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একই আল্লাহ্।

কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিলে এই দো'আ পড়িবে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ـ

অর্থাৎ, 'শোক্‌র সেই (দয়াময়) আল্লাহ্ তা'আলার, যে মুছীবত তুমি ভোগ করিতেছ, তাহা হইতে যিনি আমাকে নিরাপদে রাখিয়াছেন এবং আমাকে স্বীয় বহুসংখ্যক সৃষ্ট জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (আশরাফুল মখলুকাতরূপে সৃষ্টি) করিয়াছেন।'

তোমার নিকট যদি কেহ বিদায় হইতে আসে, তবে এইরূপ বলঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ ○

অর্থাৎ, 'তোমার দ্বীন (ধর্ম-কর্ম), আমানত (বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্ততা) এবং খাতেমা অর্থাৎ, প্রত্যেক কাজের পরিণাম (যেন ভাল হয়) সবই আল্লাহ্ তা'আলার উপর সোপর্দ করিতেছি।'

নূতন বিবাহিত বর-কনেকে মোবারকবাদ দিতে হইলে এই বলিয়া দাওঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ـ

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উভয়ের কাজে বরকত দেউক এবং তোমাদের উভয়ের উপর বরকত নাযিল করুক এবং তোমাদের উভয়কে ভালভাবে মিল-মহব্বতে রাখুক।"

কোন বিপদাপদ আসিলে এই দো'আ পড়ঃ يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ○

"হে আল্লাহ্! তুমিই প্রকৃত জীবনধারী এবং সকলের রক্ষাকারী। আমি তোমারই দয়ার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এবং ঘুমাইবার সময় এই দো'আটি তিনবার পড়িবেঃ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

"আমি সেই দয়াময়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—যিনি ব্যতীত অন্য কেহই এবাদতের যোগ্য নহে; তিনিই প্রকৃত জীবনধারী এবং (সকলের) রক্ষাকারী এবং তাঁহারই সমীপে আমি তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।" এবং একবার এই দো'আ পড়িবেঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করা যাইবে না, তিনি একক, অন্য কেহই তাঁহার শরীক নাই। তাঁহারই যাবতীয় সাম্রাজ্য, তাঁহারই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনিই সর্বশক্তিমান।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ (আল্লাহ্ পবিত্র) ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য) ৩৩ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বড়) ৩৪ বার এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ সূরাদ্বয় এক একবার এবং আয়াতুল কুরসী একবার এবং সকাল বেলায় সূরা-ইয়াসীন একবার, মাগরেবের পর সূরা-ওয়াক্বেয়া একবার, এশার পর সূরা-মুল্‌ক একবার আর শুক্রবারে সূরা-কাহ্‌ফ একবার পড়িবে।* ঘুমাইবার সময় সূরা-আলে ইমরানের শেষে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়িবে। রোজ যতটুকু পার কোরআন তেলাওয়াত করিবে।** মনে

টিকা

* এইরূপ পড়িতে পারিলে দরিদ্রতা দূর হয়। রোজ কোরআন মজীদ হইতে কমপক্ষে ১০ আয়াত তেলাওয়াত করিয়া লওয়া চাই। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, যে দশ আয়াত তেলাওয়াত করে, তাহাকেও তেলাওয়াত কারীদের মধ্যে শামিল করা হয়।

** চিন্তা করিয়া দেখ, শরীঅত তোমাকে কেমন ভাবে সব কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছে, মনে রাখিও ইহাই ধর্মের মূল।

রাখিও যে, যাহা কিছু পড়িতে বলা হইল, পড়িতে পারিলে ছওয়াব আছে, না পড়িলে কোন গোনাহ্ নাই।

কসম এবং মান্নত

১। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুরই কসম খাইতে নাই; অনেকে নিজের মাথার বা চক্ষের বা ছেলে-মেয়ের কসম খাইয়া থাকে, ইহাতে কবীরা গোনাহ্ হয়। যদি ভুলবশতঃ কখনও মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ (তওবা করিয়া) কলেমা পড়িয়া লও।

২। এরকম কসম খাইও না যে, 'যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে যেন আমি বে-ঈমান হইয়া যাই'; যদিও সত্য কথা হয় (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

৩। রাগ বা অন্য কোন কারণবশতঃ যদি এরকম কসম খাইয়া থাক যে, তাহা পূর্ণ করা গোনাহ্র কাজ, তবে সে কসম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার কাফ্ফারা দিয়া দিবে। যেমন, এই রকম কসম খাওয়া যে, 'আমি আমার মা-বাপের সঙ্গে কথা বলিব না' বা এই রকম অন্য কোন কসম খাইল।

কারবার (আদান-প্রদান) ভালরূপে করা

১। টাকা-পয়সার এত লোভ করিও না যে, হালাল হারামেরও খেয়াল না থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যদি হালাল পয়সা দান করেন, তবে তাহা অযথা উড়াইয়া দিও না; একটু চিন্তা করিয়া খরচ করিও। বাস্তবিকই যেখানে একান্ত আবশ্যক সেখানেই খরচ করিও।

২। কেহ বিপদে পড়িয়া যদি কোন জিনিস বিক্রয় করিতে আসে, তবে ঠেকা বলিয়া সুযোগ পাইয়া তাহাকে ঠকাইও না, তাহার জিনিসের দাম কম করিও না; বরং পারিলে তাহার কিছু সাহায্য কর, না হয় ত অন্ততঃ উচিত মূল্যে তাহার জিনিসটি খরিদ করিয়া লও।

৩। তোমার যদি কাহারও নিকট কিছু পাওনা থাকে, আর সে গরীব হয়, তবে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিও না, তাহাকে সময় দাও; বরং যদি সম্ভব হয় কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দাও।

৪। যদি তোমার নিকট কাহারও কিছু পাওনা থাকে আর তোমার দিবার ক্ষমতা আছে, তবে (তৎক্ষণাৎ দিয়া দাও, টালবহানা করিও না। কেননা, হাতে থাকিতে (টালবাহানা) করা বড়ই অন্যায়।

৫। যাহাতে ধার না লইতে হয়, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। একান্ত ঠেকাবশতঃ যদি লইতেই হয়, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইও না। সর্বদা পরিশোধ করিবার চিন্তায় ও চেষ্টায় থাকিও। আর যাহার নিকট হইতে ধার লইয়াছ, সে যদি তোমাকে কিছু বলে, তবে তাহার প্রতিউত্তর করিও না, অসন্তুষ্ট হইও না, ছবর করিও।

৬। হাসি-ঠাট্টা করিয়া কাহারও জিনিস এরূপভাবে সরাইয়া লুকাইয়া রাখা (যাহাতে সে পেরেশান হইতে পারে) বড়ই অন্যায় কথা।

৭। মযদুরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া তাহার মযদুরী দিতে দেরী করিও না, বা তাহার মযদুরী কম দিতে চেষ্টা করিও না।

৮। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক বিপদগ্রস্ত লোক নিজের বা পরের যে সন্তান বেচিয়া ফেলে, তাহাদের গোলাম বা বান্দী বানান হারাম।

৯। পাক করিবার জন্য একটু আগুন বা নিমক দিলে এত ছওয়াব পাওয়া যায় যেন সম্পূর্ণ ভাত সালন দান করিয়াছে।

১০। পানি পান করাইলে বড়ই ছওয়াব পাওয়া যায়। যেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায়, সেখানে ত যেমন একটা গোলাম আযাদ করিয়া দিল; আর যেখানে কম পাওয়া যায়, সেখানে ত যেমন একজন মৃতকে জীবন দান করিল।

১১। তোমার নিকট যদি কাহারও কিছু পাওনা থাকে বা কাহারও কিছু আমানতি জিনিস রাখা থাকে, তবে অন্য দুই চারিজন বিশ্বস্ত লোককে জানাইয়া রাখ অথবা কোন কাগজে লিখিয়া বা লিখাইয়া রাখ। কেননা, মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট নাই; হয়ত হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া যাইতে পারে, আর তুমি পরের দায়িক থাকিয়া মরিতে পার।

বিবাহ

১। ছেলে-মেয়ের বিবাহের সময় এই বিষয়ে বেশী খেয়াল রাখিবে, যেন কোন দ্বীনদার ধার্মিকের সঙ্গে হয়। দুনিয়ার শান-শওকত বা মালদারীর বেশী খেয়াল করিও না। বিশেষতঃ আজকালকার যমানায় ধনীর ছেলেরা ইংরাজী পড়িয়া অনেকে ঈমান হারাইয়া বসিয়াছে। এ রকম স্থলে বিবাহই দুরুস্ত হয় না, চিরজীবন যিনা করার গোনাহ্ হইতে থাকে।

২। মেয়েদের অভ্যাস আছে যে, তাহারা অনেকে স্বামীর নিকট অন্য মেয়েলোকের রূপ-গুণ বর্ণনা করিয়া থাকে। এরূপ করা অসঙ্গত। খোদা না করুন, যদি স্বামীর মন সেই দিকে চলিয়া যায় তবে (বড়ই বিপদের আশঙ্কা,) নিজেই কাঁদিয়া কাটাইবে।

৩। কোন জায়গায় যদি অন্য জায়গা হইতে বিবাহের পয়গাম আসিয়া থাকে, আর কিছু কিছু মতও দেখা যায়, তবে তুমি সেখানে নিজের কাহারও জন্য বিবাহের কথা উত্থাপন করিও না। হাঁ, যদি সে ছাড়িয়া যায় বা ঘরওয়ালা অস্বীকার করে, তবে অবশ্য বলিতে পার।

৪। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেসব বিশেষ বিশেষ কাজ বা কথা হয়, তাহা অন্য কাহারও কাছে বলাকে আল্লাহ্-তা'আলা বড়ই না-পছন্দ করেন, প্রায়ই দেখা যায় যাহাদের নূতন বিবাহ হয়, তাহারা এ বিষয়ে খেয়াল রাখে না, তাহা বড়ই অন্যায়।

৫। বিবাহের নিমিত্ত যদি তোমার কাছে কেহ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, আর সে স্থানে কিছু দোষ থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত। এমন গীবত না-জায়েয নহে; অবশ্য বিনা দরকারে কাহারও আয়েব বাহির করা চাই না।

৬। স্বামীর নিকট থাকা সত্ত্বেও যদি স্ত্রীর আবশ্যক পরিমাণ (খাওয়া পরার) খরচ না দেয়, তবে স্বামীর অগোচরে নেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু কোন বাহুল্য খরচের জন্য নহে (নিজের বা নিজের শিশু-সন্তানের জরুরী খরচের জন্য নিতে পারে)।

কাহাকেও কষ্ট দেওয়া

১। চিকিৎসা শাস্ত্র যে ভালরূপ পড়ে নাই তাহার পক্ষে এরকম কোন ঔষধ কোন রোগীকে দেওয়া, যাহাতে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে, জায়েয নহে। যদি এরূপ করে গোনাহ্ হইবে।

২। কোন অস্ত্রের দ্বারা ঠাট্টা করিয়া কাহাকেও ভয় দেখান চাই না। কেননা, হয়ত হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া আঘাত লাগিতে পারে।

৩। ছুরি, চাকু খোলা অবস্থায় কাহারও হাতে দিবে না, হয় বন্ধ করিয়া দাও না হয় কোন জায়গায় রাখিয়া দাও, সে নিজেই উঠাইয়া নিবে।

৪। কুকুর বিড়ালকে বন্ধ রাখিয়া পানাহারে কষ্ট দেওয়া বড়ই গোনাহ্।

৫। গোনাহ্গারদের অনর্থক লা'ন্‌তা'ন করা চাই না, ইহা অন্যায় কথা। অবশ্য তাহার জন্য নরমভাবে কিছু নছীহতের কথা বলিতে পার।

৬। বিনা অপরাধে কাহারও প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করা—যাহাতে সে ভীত হইতে পারে—জায়েয নহে। দেখ, যখন একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পর্যন্ত জায়েয নহে, তখন ঠাট্টা করিয়া কোথাও পলাইয়া থাকিয়া কাহাকেও হঠাৎ ভয় দেখান কত বড় অন্যায় হইবে।

৭ । যবাহ করার সময় অস্ত্রে খুব ধার দিয়া লইবে, জানোয়ারকে অযথা কষ্ট দিবে না।

৮। ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে (বা অন্য কোন জীব দ্বারা কোন কাজ লইতে হইলে) ঘোড়াকে (বা সে জীবকে) কষ্ট দিও না। এত বোঝা তাহার উপর চাপাইও না বা এত দ্রুত তাহাকে দৌড়াইও না, যাহাতে তাহার কষ্ট হইতে পারে। আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছা মাত্রই তাহার খাওয়া-পিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

খাওয়ার কু-অভ্যাস দূর করা

১। বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া খাওয়া শুরু করিবে। ডান হাত দিয়া খাইবে। (কয়েক জনে এক সঙ্গে খাইতে হইলে) নিজের সামনে থেকে খাইবে; অবশ্য কয়েক রকমের জিনিস যদি এক বর্তনে থাকে, তবে যে জিনিস খাইতে রুচি হয়—উঠাইয়া লইতে পার।

২। খাওয়ার সময় আঙ্গুল চাটিয়া খাইবে। আর বর্তন খালি হইয়া গেলে তাহা ছাফ করিয়া খাইবে।

৩। খাইবার সময় খাওয়ার জিনিস যদি নীচে পড়িয়া যায়, তাহা উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া খাইতে ঘৃণা বোধ করিবে না।

৪। খেজুর, আঙ্গুর বা ফুট, তরমুজের টুকরা ইত্যাদি জিনিস কয়েক জনে এক সঙ্গে খাইতে হইলে একটি বা এক এক টুকরা করিয়া উঠাইবে, দুই তিনটি এক সঙ্গে উঠাইবে না।

৫। পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি কোন দুর্গন্ধ বিশিষ্ট জিনিস খাইয়া কোন মজলিসে যাইতে হইলে প্রথমে মুখ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইবে, যেন কোনরূপ দুর্গন্ধ না থাকে।

৬। প্রত্যহ পাকাইবার সময় চাউল, ডাল ইত্যাদি জিনিস মাপিয়া লইবে, আন্দাজি খাইতে থাকিবে না।

৭। যে কোন হালাল জিনিস খাইয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিবে।

৮। খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধুইবে ও কুল্লি করিবে।

৯। খুব গরম ভাত, ছালন ইত্যাদি খাইবে না। (হাঁ, যদি এরকম কোন জিনিস হয় যে, গরম গরম না খাইলে তাহার স্বাদ থাকে না, তবে তাহাতে ক্ষতি নাই।)

১০। মেহ্‌মানের খুব খাতির করা চাই। আর যদি তুমি কোথাও মেহ্‌মান হও, তবে তথায় এত বেশী দেরী করিও না, যাহাতে তাহাদের বিরক্তি বোধ হইতে পারে!

১১। এক সঙ্গে খাওয়াতে বরকত হয়।

১২। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে প্রথমে দস্তরখান উঠাইয়া দিবে, পরে নিজে উঠিবে। দস্তরখান না উঠাইয়া নিজে উঠিয়া গেলে বে-আদবী হয়। যদি কয়েকজন এক সঙ্গে খাইতে বস, আর অন্যান্যের খাওয়া শেষ হইবার পূর্বেই তোমার খাওয়া শেষ হইয়া যায়, তবে একা একা উঠিয়া যাইও না; অল্প অল্প খাইতে থাক, নতুবা তোমার সাথীরা লজ্জায় পড়িয়া ক্ষুধার্ত থাকিয়া যাইতে পারে। যদি একান্ত দরকার হয়, তবে ওযর পেশ করিয়া উঠিতে পার।

১৩। মেহ্‌মানকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া সুন্নত।

১৪। পানি এক শ্বাসে পান করিবে না, তিন শ্বাসে পান করিবে, আর শ্বাস ফেলিবার সময় পাত্রকে মুখ হইতে সরাইয়া দিবে, যেন পানিতে শ্বাস না লাগে। পানি পান করিবার সময় “বিস্‌মিল্লাহ্‌” বলিয়া পান করিবে। পান শেষ করিয়া “আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌” পড়িবে।

১৫। যে-সব বর্তন (পাত্র) এরকম যে, হয়ত হঠাৎ অনেকটা পানি আসিয়া যাইতে পারে বা এরকম যে, তাহার ভিতরকার অবস্থা জানা যাইতে পারে না, হয়ত ভিতরে কোন পোকা বা কাঁটা থাকিতে পারে, সেরকম বর্তনে মুখ লাগাইয়া পানি পান করিও না।

১৬। বিনা প্রয়োজনে দাঁড়াইয়া পানি পান করিও না। (যদি একান্ত ঠেকা হয়, সে ভিন্ন কথা)।

১৭। পানি পান করিয়া যদি অন্যকে দিতে হয়, তবে যে তোমার ডান দিকে আছে তাহাকে প্রথমে দাও, সে তাহার ডান দিকে যে আছে তাহাকে দিবে। এরূপে যদি অন্য কোন বস্তু ভাগ করিয়া দিতে হয়, যেমন পান, আতর, মিঠাই সকলেরই এই হুকুম।

১৮। বর্তনের মুখ যদি কিছু ভাঙ্গা হয়, তবে ভাঙ্গা দিকে পানি পান করিও না।

১৯। সন্ধ্যার সময় ছেলে-মেয়েদের বাহিরে থাকিতে দিও না। রাত্রে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া দরজা বন্ধ করিবে। বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া থাল, বাসন, হাড়ি-পাতিল ঢাকিয়া রাখিবে; ঘুমাইবার সময় বাতি নিবাইয়া রাখিবে এবং চুলার আগুনও নিবাইয়া ফেলিবে বা ভালরূপে ঢাকিয়া রাখিবে।

২০। কোন খাওয়ার জিনিস কোথাও পাঠাইলে ঢাকিয়া পাঠাইবে।

কাপড় ইত্যাদি পরা

১। একখানা জুতা পরিয়া হাঁটিও না। চাদর এরকমভাবে গায়ে দিও না, যাহাতে জল্‌দি হাত বাহির করিতে বা হাঁটিতে কষ্ট হইতে পারে।

২। কাপড় পরার সময় ডান দিক দিয়া এবং খোলার সময় বাম দিক দিয়া শুরু করিবে। যেমন, কোরতার ডান আস্তিন প্রথমে পরিবে, পায়জামার ডান পা প্রথমে পরিবে এবং খোলার সময় বাম আস্তিন এবং বাম পা প্রথমে খুলিবে।

৩। নূতন কাপড় পরিয়া এই দো‘আ পড়িবে, ইহাতে গুনাহ্‌ মাফ হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ ○

অর্থাৎ, শোক্‌র সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার কোন ক্ষমতা, কোন শক্তি না থাকা সত্ত্বেও আমাকে ইহা পরিধানের নিয়ামত দান করিয়াছেন।

৪। এরকম কাপড় পরিও না, যাহাতে রীতিমত পর্দা হয় না।

৫। যে সব লোক নানারকম মূল্যবান যেওর, কাপড় ব্যবহার করে, তাহাদের কাছে বেশী বসিও না; হয়ত বৃথা তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতে পারে।

৬। কাপড় তালি লাগানকে অপমানজনক মনে করিও না।

৭। অতি শান-শওকতের কাপড়ও পরিও না বা একেবারে ময়লা কাপড়ও পরিও না। মধ্যম রকমের কাপড় পরিবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

৮। চুলের যত্ন করা দরকার (তৈল দিয়া কাঙ্গি করিবে), কিন্তু তাই বলিয়া সব সময় এই খেয়ালেই লাগিয়া থাকা চাই না। (মেয়েলোকের জন্য) হাতে মেহেদী লাগাইয়া রাখা ভাল।

৯। সুরমা উভয় চোখেই তিন তিনবার করিয়া লাগাইবে।

১০। ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

রোগের চিকিৎসা

১। রোগীকে খাওয়ার জন্য বেশী জোর-যবরদস্তি করা চাই না।

২। কোন অসুখ হইলে যে সব জিনিসে অপকার করে, তাহা খাইবে না ; সতর্ক হইয়া চলিবে।

৩। যে সব তাবীয বা মন্ত্র-তন্ত্র শরীঅতের খেলাফ, সে সব কখনও ব্যবহার করিবে না।

৪। যদি কাহারও উপর কাহারও নযর লাগে, তবে যাহার নযর লাগার সন্দেহ হয়, তাহার মুখ, কনুই সমেত উভয় হাত, উভয় পা, উভয় হাঁটু এবং আবদস্ত করার জায়গাকে ধোয়াইয়া সেই পানি যদি যে ব্যক্তির উপর নযর লাগিয়াছে তাহার মাথার উপর ঢালিয়া দিতে পার, তবে খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

৫। যে সব রোগ দেখিলে সাধারণতঃ লোকের স্বাভাবিকভাবে ঘৃণা জন্মে যেমন, পাঁচড়া, কুষ্ঠ, বসন্ত ইত্যাদি—সে সব রোগীদের নিজেরই দূরে দূরে থাকা ভাল। তাহা হইলে কাহারও কষ্ট হইবে না, নিজেও অন্যান্যের ঘৃণায় পতিত হইবে না।

স্বপ্ন

১। যদি খারাপ কোন স্বপ্ন দেখ, তবে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেল এবং তিনবার—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

অর্থাৎ, “শয়তান মরদুদ হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। (অতএব, হে আল্লাহ্! আমাকে শয়তানের হাত হইতে বাঁচাও।)” পড় এবং পাশ বদলিয়া শোও, আর অন্য কাহারও কাছে এই স্বপ্ন বলিও না।

২। যদি স্বপ্নের কথা কাহারও কাছে বলিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রকৃত জ্ঞানী লোকের কাছে বলিবে বা এ রকম কোন লোকের কাছে বলিবে, যে তোমাকে দিলের সহিত ভালবাসে এবং তোমার জন্য বুরা তা'বীর না করে, তবে খোদা চাহে ত কোন ক্ষতি হইবে না।

সালাম

১। পরস্পর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্‌সালামু আলাইকুম) বলিয়া সালাম করিবে এবং وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (ওয়ালাইকুমুস্‌সালাম) বলিয়া জওয়াব দিবে। ইহা ছাড়া অন্য যত রকমের সালামের প্রচলন আছে, সবই অযথা ও সুন্নতের খেলাফ।

২। যে-ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে-ই বেশী সওয়াব পায়।

৩। যদি কেহ অন্য কাহারও সালাম তোমার নিকট পৌঁছায়, তবে عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (আলাইহিম ওয়াআলাইকুমুস্সালাম) বলিয়া জাওয়াব দিবে।

৪। কয়েক জনের মধ্যে হইতে একজনে সালাম করিলেও সবের তরফ হইতেই আদায় হইয়া যাইবে। এইরূপে সমস্ত মজলিসের মধ্যে মাত্র একজনে জওয়াব দিলেও সবের তরফ হইতেই আদায় হইয়া যাইবে।

হাঁটা, বসা, শোয়া ইত্যাদি

১। সাজিয়া-গুজিয়া গর্বিতভাবে চলিবে না।

২। উল্টাভাবে অর্থাৎ উপুড় হইয়া শুইবে না।

৩। এমন জায়গায় ঘুমাইবে না, যেখান হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। হয়ত ঘুমের মধ্যে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতে পার।

৪। কিছু অংশ ছায়ায় কিছু অংশ রৌদ্রে—এরকমভাবে বসিও না ও শুইও না।

৫। কোন ঠেকাবশতঃ যদি মেয়ে লোককে রাস্তায় বাহির হইতে হয়, তবে রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া চলিবে। কেননা, রাস্তার মাঝখান দিয়া হাঁটা মেয়েলোকের জন্য বড়ই বে-হায়ায়ীর কথা।

অন্যের সঙ্গে বসা

১। কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বসিও না।

২। মজলিসের মধ্য হইতে যদি কেহ উঠিয়া কোন কাজে যায় এবং ভাবে বুঝা যায় যে, সে আবার আসিয়া বসিবে, তবে তাহার জায়গায় অন্য কাহারও বসা চাই না, সে জায়গা তাহারই হক্।

৩। দুইজন লোক এক জায়গায় কাছে কাছে বসিয়া আছে, তুমি গিয়া তাহাদের উভয়ের মাঝখানে বসিও না, অবশ্য যদি তাহারা উভয়ে খুশী হইয়া বসাইয়া লয়, তবে ক্ষতি নাই।

৪। তোমার সঙ্গে যদি কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসে, তবে তাহাকে দেখিয়া একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিবে। তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহাকে সমাদর করা হইয়াছে।

৫। নিজে সাজিয়া বড় হইয়া বসিও না। যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, গরীবদের মত তথায় বসিয়া পড়।

৬। হাঁচি আসিলে মুখের উপর হাত বা কাপড় রাখিয়া দিবে এবং বেশী শব্দ হইতে দিবে না।

৭। হাইকে যথাসাধ্য থামাইয়া রাখিবে, একান্ত না থামিলে মুখ চাপিয়া লইবে।

৮। উচ্চস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিও না।

৯। মজলিসের মধ্যে বড় মানুষীভাবে গাল ফুলাইয়া বসিও না, মিস্কীনের ন্যায় বস। যদি কোন কাজের কথা থাকে তাহাও বলিতে পার; অবশ্য যে কথায় গোনাহ্ হয়, সে সব কথা বলিও না।

১০। মজলিসের মধ্যে পা ছড়াইয়া বসিও না।

কথা

১। চিন্তা না করিয়া কোন কথাই বলিবে না। খুব চিন্তা করিয়া যখন দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যায় যে, এ কথায় কোন প্রকারেই দোষ নাই, তখনই সে কথা বলিবে।

২। কাহাকেও বে-ঈমান বলা বা এই রকম বলা যে, অমুকের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত হউক বা আল্লাহ্ তা'আলার গযব নাযিল হউক বা দোযখ নছীব হউক, তাহা কোন গরু বাছুরকে বা কোন মানুষকেই বলুক, ইহা বড়ই গোনাহ্র কাজ। এইরূপ যাহাকে বলা হয়, সে যদি সে রকম না হয়, যে বলে তাহারই উপর বর্তিয়া থাকে।

৩। কেহ যদি তোমাকে অন্যায়ভাবে কোন কথা বলে, তবে তুমিও ঠিক ততটুকু পরিমাণ তাহাকে বলিতে পার, কিন্তু বিন্দুমাত্র বেশী হইলেই তুমি গোনাহ্গার হইবে। (অতএব, মাফ করিয়া দেওয়া প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা ভাল। কারণ, সম্পূর্ণ ঠিক ঠিক প্রতিশোধ লওয়া প্রায় অসম্ভব।)

৪। দুমুখো কথা বলিও না। অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই সম্মুখে তাহার মন রক্ষা করিয়া তাহার পছন্দ মত কথা বলিবে না।

৫। চোগলখোরী করিবে না। আর অন্য কেহ যদি তোমার কাছে অন্য কাহারও সম্বন্ধে চোগলখোরী করিতে চায়, তাহাও শুনিবে না।

৬। মিথ্যা কিছুতেই বলিবে না।

৭। খোশামোদের জন্য কাহারও সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিও না। আর অসাক্ষাতেও যোগ্যতার চেয়ে বেশী তা'রীফ করিও না।

৮। কাহারও গীবত কখনও করিবে না। কাহারও অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে এরকম কোন কথা বলা, যাহাতে তাহার মনে ব্যথা লাগে, তাহা সত্যই হউক না কেন, 'ইহাকেই বলে গীবত'। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহাকে বলে, 'বোহ্তান,' সে আরও বড় গোনাহ্।

৯। কাহারও সহিত তর্কবিতর্ক করিবে না। নিজের কথাকেই উপরে রাখিতে চেষ্টা করিবে না।

১০। বেশী হাসিও না। বেশী হাসিলে দিল মরিয়া যায়।

১১। যদি কাহারও গীবত করিয়া থাক, তবে তাহার নিকট হইতে মাফ করাইয়া লওয়া দরকার। যদি না পার, তবে তাহার জন্য এস্তেগ্ফার অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দো'আ করিতে থাক, যেন তাহাকে মাফ করিয়া দেন। তাহা হইলে আশা করা যায় যে, কিয়ামতের দিন সেও তোমাকে মাফ করিয়া দিবে।

১২। মিথ্যা ওয়াদা করিও না, ওয়াদা করিয়া খেলাফ করিও না।

১৩। কাহারও সহিত এরূপভাবে হাসিঠাট্টা করিও না, যাহাতে সে মনে কষ্ট পাইতে পারে বা লজ্জিত হয়।

১৪। নিজের কোন জিনিস বা নিজের কোন গুণের উপর বড়াই করিও না।

১৫। কবিতা পাঠে তত মত্ত হইও না। হাঁ, যদি শরীঅতের খেলাফ কোন কথা না থাকে, তবে মাঝে মাঝে কোন নছীহত বা দো'আর কবিতা আস্তে আস্তে পড়াতে কোন ক্ষতি নাই।

১৬। না জানিয়া শুনিয়া কথা কহিও না; কেননা, প্রায়ই এরকম কথা মিথ্যা হইয়া থাকে।

বিবিধ

১। চিঠি লিখিয়া তাহার উপর কিছু ধুলা ছড়াইয়া দাও; ইহাতে যে কাজের জন্য চিঠি লিখিয়াছ সে কাজ খোদা চাহে ত সহজে হইয়া যাইবে।

২। জামানাকে মন্দ বলিও না, এবিষয়ে লোকেরা খেয়াল করে না, সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, সময়টা বড়ই খারাপ। এইরূপ বলা অনুচিত।

৩। চাবাইয়া চাবাইয়া কথা বলিও না বা অনেক লম্বা চওড়া এবং বাড়াইয়া কথা বলিও না, যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই বলিবে।

৪। কেহ যদি গান করিতে থাকে, সে দিকে কান লাগাইও না।

৫। কাহারও কোন খারাপ অবস্থা বা কথার অনুকরণ ও ব্যঙ্গ করিও না।

৬। কাহারও মধ্যে কোন দোষ দেখিলে তাহা ঢাকিয়া রাখা উচিত, গাহিয়া বেড়ান উচিত নয়। হাঁ, যদি কোন জরুরতবশতঃ যাহের করিতে হয়, তবে ক্ষতি নাই। যেমন, এক ব্যক্তির মধ্যে কোন আয়েব আছে, যদি তুমি সে আয়েব যাহের না কর, তবে হয়ত অন্য লোক ধোঁকা খাইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহার আয়েব যাহের করিয়া দেওয়া ভাল; বরং তাহাতে ছওয়াব পাওয়া যাইবে। আবার কোন কোন সময় আয়েব যাহের করা ওয়াজিবও হইয়া পড়ে।

৭। যে কোন কাজ কর, প্রথমে খুব ভালরূপে চিন্তা করিয়া, পরিণাম ভাবিয়া শান্তির সহিত করিবে। কেননা, তাড়াতাড়ি করাতে প্রায়ই কাজ খারাব হয়।

৮। তোমার কাছে যদি কেহ কোন পরামর্শ চায়, তবে তোমার কাছে যাহা ভাল মনে হয়, সেই পরামর্শই তাহাকে দাও।

৯। যাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা কর তাহাদের নিকট হইতে নিজের খাতা-কছুর মাফ করাইয়া লও; নতুবা কিয়ামতের দিন বড় বিপদ হইতে পারে।

১০। পার্শ্ববর্তী লোকদেরও ভাল কাজ করিতে এবং মন্দ কাজ ছাড়িতে উপদেশ দিতে থাক। হাঁ, যদি একেবারে আশাই না থাকে যে, তাহারা শুনিবে বা এই ভয় হয় যে, হয়ত তোমাকে কষ্টও দিতে পারে, তবে অবশ্য চুপ থাকা জায়েয আছে; কিন্তু মনে মনে সেই কাজকে মন্দ জানিতে থাকিবে, আর নেহায়েত ঠেকা না হইলে এই রকম লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা করিবে না।

মনের সংশোধন ও লোভের প্রতিকার

বেশী খাওয়ার কারণে অনেক গোনাহ্ হয়। অতএব, খাওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি পালন করিয়া চলিবে।

(১) সব সময় মজাদার খানা খাওয়ার পাবন্দী করিও না। (হাঁ মাঝে মাঝে কখনও যদি হয় ক্ষতি নাই।) (২) হারাম রুযী হইতে দূরে থাকিবে। (৩) পেটকে খুব বেশী ভরিবে না; বরং দুই-চার লোকমার ক্ষুধা থাকিতে খাওয়া শেষ করিবে।

পরিমাণের চেয়ে কিছু কম খাওয়ার অভ্যাস করিলে নিম্নলিখিত উপকার পাইবেঃ (১) দিল ভাল থাকিবে, আর দিল ভাল থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত দেখিতে পাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মহব্বত পয়দা হইবে। (২) দিল নরম থাকিবে। দিল নরম হইলে দো'আ এবং যিক্‌রে খুব মজা পাইবে। (৩) নফ্‌সের ছরকাশী ও বড়াই ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। (৪) এইরূপ করাতে নফ্‌সের কিছু কষ্ট হইবে, তখন কষ্ট দেখিয়া আল্লাহ্‌র আযাবের কথা মনে উঠিবে। অতএব, ক্রমশঃ গোনাহ্‌র কাজ ত্যাগ করিতে শিখিবে। (৫) গোনাহ্ করার ইচ্ছা তত থাকিবে না, ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। (৬) শরীর ভাল থাকিবে, অলসতা বোধ হইবে না, ঘুমও কম হইবে, তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য এবাদতে আলস্য বোধ হইবে না। যাহারা খাইতে পায় না সেইসব দরিদ্রের প্রতি দয়া আসিবে, বরং প্রত্যেকের প্রতিই দয়ার সৃষ্টি হইবে।

বেশী কথা বলার দোষ

বেশী কথা বলাও এটি বড় রোগ, নফ্‌সও বেশী কথা বলিতে ভালবাসে, অথচ এই বেশী কথা বলার দরুনই মানুষ শত শত গোনাহ্‌তে লিপ্ত হয়; যেমন—(১) মিথ্যা বলা, (২) কাহারো গীবত করা, (৩) কাহাকেও অভিশাপ দেওয়া, (৪) নিজের বড়াই করা, (৫) অযথা কাহারও সহিত তর্ক বাধাইয়া দেওয়া, (৬) বড় লোকের খোশামোদ করা, (৭) কাহারও সহিত হাসিঠাট্টা করিতে গিয়া এরকম কথা বলা, যাহাতে সে মনে কষ্ট পায়। এইসব গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় মুখ বন্ধ করিয়া থাকা অর্থাৎ মুখ সামলাইয়া কথা বলা। আর মুখ বন্ধ রাখার উপায় এই যে, যখন কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করার ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ তাহা না বলা; বরং চিন্তা করিয়া দেখা, কথাটি বলিলে কোন গোনাহ্ হইবে কি ছওয়াব হইবে, বা ছওয়াবও হইবে না, গোনাহ্‌ও হইবে না। যদি তাহাতে অল্প কিংবা বেশী গোনাহ্ হয়, তবে সে কথা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিবে না, মুখকে সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া লইবে। আর যদি ভিতর হইতে নফ্‌স তাহা বলিবার জন্য তাগাদা করে, তবে তাহাকে এই রকমভাবে বুঝাও যে, এখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া অল্প একটু কষ্ট সহ্য করা সহজ; কিন্তু পরকালে দোযখের আযাব বড় ভয়ঙ্কর (এবং বহু কালব্যাপী) হইবে।

যদি দেখ যে, এইরূপ কথা বলিলে ছওয়াব হইবে, তবে বলিয়া দিবে। আর যদি দেখ যে, এরূপ কথাতে ছওয়াবও নাই গোনাহ্‌ও নাই, তবেও তাহা বলিবে না। যদি একান্ত না বলিয়া থাকিতে না পার, তবে অল্প বলিয়া চুপ হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক কথাই এই রকম চিন্তা করিয়া বলিতে থাক। খোদা চাহে ত অল্প দিনের মধ্যেই মন্দ কথা বলিতে নিজেরই ঘৃণাবোধ হইতে থাকিবে। মুখ সামলাইয়া রাখিবার ইহাও এক উপায় যে, একান্ত জরুরত না হইলে কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে না। একা একা থাকিলে বেহুদা কথা বলিতে পারিবে না।

রাগ দমনের পন্থা

রাগ হইলে বুদ্ধি ঠিক থাকে না, আর পরিণাম চিন্তা করিবারও খেয়াল থাকে না। কাজেই মুখ দিয়াও নানারূপ অন্যায় কথা বাহির হইয়া যায়, বা অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজও করিয়া ফেলে। অতএব, এহেন দুশমনকে দমন করা চাই। দমন করিবার উপায় এই—সর্বপ্রথমে যাহার উপর রাগ হইাছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সম্মুখ হইতে সরাইয়া দাও। আর যদি সে না যায় তবে নিজেই তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও। তারপর চিন্তা করিয়া দেখ যে, তোমার নিকট সে যতটুকু অপরাধী, তার চেয়ে ত তুমিই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বেশী অপরাধী। আবার তুমি যেমন চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন, সেই রকমেই তোমারও তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচিত। মুখে আউযুবিল্লাহ্ কয়েকবার পড়িবে এবং পানি পান করিবে বা ওযূ করিবে। এইরূপ করিলে ক্রমশঃ রাগ চলিয়া যাইবে। তারপর যখন বুদ্ধি ঠিক হয়, তখন তাহার অপরাধ দেখিয়া যদি শাস্তি দেওয়াই সঙ্গত বোধ হয় অর্থাৎ শাস্তিতে অপরাধীর উপকার হইবে মনে হয়। যেমন নিজের সন্তান, কেননা তাহাদের চরিত্র সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক, বা

অপরাধী অন্য কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছে, এখন তাহার প্রতিশোধ লওয়া উচিত; তবে প্রথমে চিন্তা করিয়া দেখ যে, কতটুকু অপরাধ এবং সে অনুপাতে কত পরিমাণ শাস্তি হওয়া দরকার? এবিষয়ে শরীঅত অনুযায়ী যখন নিঃসন্দেহভাবে ব্যবস্থা মাথায় আসিয়া যায়, তখন অবশ্য সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পার। এইরূপে কিছু দিন পর্যন্ত রাগকে দমন করিতে থাকিলে পরে আর তত জোর থাকিবে না; ক্রমশঃ তোমারই কাবু হইয়া যাইবে। রাগের কারণেই মনের মলিনতা অর্থাৎ কীনা হইয়া থাকে; রাগের সংশোধন হইয়া গেলে পরে কীনারও সংশোধন হইয়া যাইবে, মনের মলিনতাও দূর হইয়া যাইবে।

হাসাদ, হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা

কাহারও ভালভাবে খাইতে পরিতে, সুখে জীবন-যাপন করিতে দেখিয়া বা কাহারও মান-সম্মান, এলম-লেয়াকত দেখিয়া যে এক প্রকার মনঃকষ্ট উপস্থিত হয় এবং আকাঙ্ক্ষা হয় যে, এই সব তাহার না থাকুক বা চলিয়া যাউক, তবে মন সন্তুষ্ট হয়, ইহাকেই বলে হাসাদ বা হিংসা অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা। হাসাদ বড়ই খারাপ জিনিস। ইহাতে যেমন একদিকে গোনাহ্ হয়, তেমনই এরকম জীবনে কখনো শান্তি পায় না। চিরকাল কষ্টেই কাল যাপন করে। দ্বীন এবং দুনিয়া উভয়ই পণ্ড হয়। হাসাদ যখন এতদূর অনিষ্টকর, কাজেই তাহা হইতে মুক্তি পাইবার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। মুক্তি পাইবার উপায় এই যে, প্রথমে চিন্তা করিয়া দেখ যে, হাসাদ করিলে তাহার কোনই ক্ষতি নাই, তোমারই ক্ষতি হইতেছে এবং তুমিই কষ্ট ভোগ করিতেছ। তোমার ক্ষতি এই যে, হাসাদ করার কারণে তোমার সমস্ত নেকী বরবাদ হইতেছে। কেননা, হাদীস শরীফে আছে যে, যেরূপ আগুন কাষ্ঠকে খাইয়া (জ্বালাইয়া) ফেলে, ঠিক সেইরূপ হাসাদ মানুষের নেকীকে খাইয়া ফেলে। (মতলব এই যে, তুমি যদি কাহারও প্রতি হাসাদ কর, তবে কিয়ামতের দিন তোমার নেকী তাহাকে দেওয়া হইবে; আর তুমি খালি হাত থাকিয়া যাইবে। অতএব, তোমার সেই পরিমাণ সৎকাজ বরবাদ যাইবে) ইহার কারণ এই যে, হাসাদকারী স্পষ্টভাবে না বলিলেও পরোক্ষভাবে বলিতে চায় যে, (নাউযুবিলাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায় করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এ ধন-সম্পত্তির যোগ্য ছিল না অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করা হইয়াছে, তা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মোকাবেলা করা হয় (তওবা)। ভাবিয়া দেখ, কত বড় গোনাহ্! আর কষ্ট ত স্পষ্টই দেখা যায় যে, হাসাদকারী সর্বদাই অশান্তিতে বাস করে, জীবন ভরিয়া কখনও সুখ পায় না। আর যাহার উপর হাসাদ করা হয় তাহার কোন ক্ষতি নাই। কেননা, হাসাদের কারণে তাহার ধন-সম্পত্তি কিছুতেই কম হইতে পারে না, বরং তাহার লাভ। কেননা, সে হাসাদকারীর নেকী পাইতে থাকিবে। এই রকমভাবে খুব চিন্তা করিয়া তারপর যাহার উপর হাসাদ হইয়াছে, নিজ মুখে লোক সমাজে তাহার তারীফ এবং প্রশংসা করিবার জন্য নিজের মনকে জোর জবরদস্তি বাধ্য করিবে এবং বলিবে যে, আল্লাহ্র শোক্র যে, তাহার কাছে এমন এমন নেয়ামত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আরও দ্বিগুণ চতুর্গুণ দান করুন। আর যদি তাহার সঙ্গে কখনও দেখা হয়, তবে তাহার প্রতি নেহায়েত ভক্তি প্রদর্শন করিবে (মন যদিও করিতে চায় না, তবুও জোর জবরদস্তি করিবে) এবং তাহার সহিত নেহায়েত নম্র ব্যবহার করিবে। প্রথমে প্রথমে এইরূপ ব্যবহার করিতে নফ্সের বড়ই কষ্ট হইবে, কিন্তু ক্রমশঃ খোদার ফযলে কষ্ট কম হইতে থাকিবে, নফ্সের দুষ্টামি হ্রাস পাইতে থাকিবে, হাসাদও চলিয়া যাইবে। এই হইল হাসাদ রোগের চিকিৎসা।

দুনিয়া এবং অর্থ লোভ ও তাহার প্রতিকার

টাকা-পয়সার লোভ এত বড় খারাপ জিনিস যে, একবার ঢুকিলে আর আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইয়াদ থাকিতে পারে না। কেননা সে ত সব সময়ই চিন্তা করিবে যে, টাকা কেমন করিয়া আসিবে, টাকা কেমন করিয়া জমা হইবে? এমতাবস্থায় কখন এবং কেমন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করিবে? আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মহব্বত করিতে গেলে যে কাজের ক্ষতি হয় তাহাই বা করিবে কেন? সে ত শুধু এই চিন্তায় জীবন নষ্ট করিবে যে, কাপড় এই রকম হওয়া চাই, অন্যান্য আসবাব-পত্র এই রকম হওয়া চাই, বাড়ী-ঘর ও বাগ-বাগিচার এই রকম সুবন্দোবস্ত করা চাই ইত্যাদি। বল ত দেখি, এত জঞ্জাল যার মধ্যে সব সময় ভরা থাকে, তার মনে কি আর একবারও আল্লাহ্র কথা জাগিতে পারে? অর্থের লোভের আর এক দোষ এই যে, যাহার মনের মধ্যে অর্থের লোভ একবার বসিয়া যায়, সে কিছুতেই আল্লাহ্র কাছে যাইতে অর্থাৎ মরিতে চায় না; বরং তাহা বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে করে। কেননা, সে জানে যে, মরা মাত্রই তাহার এই ভোগ বিলাস, এইসব আরাম-আয়েশের লেশমাত্রও থাকিবে না। আবার কখনও এরকম হয় যে, মরার অব্যবহিত পূর্বে দুনিয়াকে বর্জন করা তাহার নিকট বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। আর যখন জানিতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাকে দুনিয়া হইতে ছাড়াইতেছেন, তখন (তওবা, তওবা) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাগান্বিত হইয়া ঈমান হারায় এবং কুফরী হালাতে মরে। "নাউযুবিল্লাহি মিন যালেক।" আর এক দোষ এই যে, অর্থের লোভে পড়িয়া যখন অর্থ সংগ্রহ করাতে লাগিয়া যায়, তখন আর হালাল, হারাম, হক, না-হক্ ও সত্য-মিথ্যার খেয়াল থাকে না। টাকা পাইলেই হইল—ধোঁকাবাজি করিয়াই হউক বা সুদ, ঘুষ খাইয়া হউক, যে রকমেই পারে ধনাগারের উন্নতি করিতে পারিলেই হইল; এইসব কারণেই হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, দুনিয়ার মায়াই সর্বপ্রকার পাপের মূল।

যখন লোভ এত মারাত্মক জিনিস, তখন ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য। মনকে এহেন অপবিত্র জিনিস হইতে পবিত্র করা যারপর নাই আবশ্যক। তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় এই যে, প্রথমে ত মৃত্যুকে খুব বেশী করিয়া স্মরণ করা চাই, এবং সব সময় এই চিন্তা করা চাই যে, এইসব একদিন ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তবে ইহাতে মনোনিবেশ করিয়া কি লাভ? বরং যতই মনের আকর্ষণ এইসব জিনিস-পত্রের দিকে বেশী হইবে তাহা ছাড়িবার সময় ততই অধিক কষ্ট হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই করা চাই যে, অধিক লোকের সহিত দুস্তি-মহব্বত, আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ লেনদেন করা চাই না, আসবাব-পত্র জায়গা-জমিও জরুরতের চেয়ে বেশী সংগ্রহ করা চাই না। কারবার, ব্যবসায়-বাণিজ্যও অনেক বেশী বিস্তৃত করা চাই না, যে পরিমাণ হইলে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়—তাহা অপেক্ষা বেশী বাড়ান চাই না। ফলকথা এই যে, সব সামানই সংক্ষেপ রাখা উচিত। তৃতীয়তঃ, এই করা চাই যে, অযথা অপব্যয় করা চাই না। কেননা, বেহুদা খরচ করিলে আয় বৃদ্ধি করারও লোভ জন্মে, আর এই লোভেই সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়। চতুর্থতঃ, মোটা খাওয়া-পরার অভ্যাস করা চাই;

পঞ্চমতঃ, দরিদ্রদের সহিত সব সময় উঠা-বসা করিবে, ধনীদের সংসর্গে যাইবে না। কারণ তাহাতে নানা প্রকার বড় মানুষির খেয়াল দেমাগের মধ্যে ঢুকে। ষষ্ঠতঃ, যে সব বুযুর্গেরা দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জিবনী মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে। সপ্তমতঃ, যে জিনিসের সঙ্গে মনের খুব বেশী তা'আল্লুক হয়, তাহা হয় কাহাকেও দিয়া দিবে, না হয় বেচিয়া ফেলিবে। এই সব তদবীর করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ দিল হইতে দুনিয়ার মহব্বত দূর হইয়া যাইবে এবং যে সমস্ত বড় বড় দুরাশা মনকে আলোড়িত করিতে থাকে, যথা—এই রকমভাবে টাকা সংগ্রহ করিব, ছেলেপিলের জন্য এত টাকা এবং এত জায়গা-জমিন রাখিয়া যাইব। (ছেলেমেয়েকে এই রকম বড় ঘরে বিবাহ দিব, সে সবও ক্রমশঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ মন হইতে দূরীভূত হইতে থাকিবে। এই হইল সর্বাপেক্ষা বড় রোগ—দুনিয়ার মহব্বতের মহৌষধ।) দুনিয়ার মহব্বত যখন চলিয়া যাইবে এইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজে নিজেই দূর হইয়া যাইবে।

কৃপণতার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার

কৃপণতা এত বড় খারাপ জিনিস যে, অনেকগুলি ফরয ও ওয়াজিব ইহার কারণে আদায় হয় না। যেমন—যাকাত দেওয়া, কোরবানী করা, অভাবগ্রস্তের সাহায্য করা, নিজের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের উপকার করা। এই সব নেক কাজ হইতে বঞ্চিত থাকা এবং এই সমস্ত পাপের বোঝা কাঁধে লওয়া সবই একমাত্র বখিলীর কারণে। এইত হইল দ্বীনের নোকছান। আর দুনিয়ার নোকছানও অনেক আছে। তাহা এই যে, বখীলকে সকলেই ঘৃণা করে, এর চেয়ে নোকছান আর কি হইতে পারে? এ দুরন্ত রোগের চিকিৎসা এই যে, প্রথমতঃ ধন-সম্পত্তির ও দুনিয়ার লালসাকে মন হইতে বাহির করিয়া দিবে, যখন মালের মহব্বত না থাকিবে, তখন কৃপণতা থাকিতেই পারে না; (কেননা, মালের মহব্বতের কারণেই লোক বখিলী করে।) দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থা যে, যে সব জিনিস একান্ত আবশ্যকীয় নয় তাহা কাহাকেও দিয়া ফেলিবে, যদিও মনে না চায় এবং কষ্ট হয় তবুও দিয়া ফেলিবে। তাহাতে কষ্ট হইলে একটু হিম্মত করিয়া কষ্ট সহ্য করিয়া লও। যাবৎ বখিলী মনের মধ্যে থাকে তাবৎ এই রকমই করিতে থাকিবে।

প্রশংসা ও যশের আকাঙ্ক্ষার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার

সুখ্যাতির লোভ মনের মধ্যে পড়িলে পরে অন্যের সুখ্যাতি প্রশংসা দেখিয়া মনে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং হাসাদ পয়দা হয়। আর হাসাদের অপকারিতা উপরেই জানিয়াছ। তা ছাড়া অন্যের অপমান বা পরাজয়ের কথা শুনিয়া মনে আনন্দ জন্মে। অন্যের মন্দ চাওয়া বা মন্দ দেখিয়া আনন্দিত হওয়াও বড়ই গোনাহ্‌র কাজ। ইহাও এক খারাবী যে, অনেক সময় নাজায়েয উপায়ে সুখ্যাতি অর্জন করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, বিবাহ শাদীতে সুনামের জন্য অযথা নানারূপ অপব্যয় করা হয়, আর এই অপব্যয়ের মাল অনেক সময় ঘুষ লইয়া খরচ করা হয়, বা সুদী করিয়া লওয়া হয়। এ সমস্ত গোনাহ্ কেবল নামের লোভের কারণে হয়; আর এতে দুনিয়ার নোকছান এই যে, যাহার নাম বেশী হয়, তাহার অনেক লোক শত্রু হইয়া পড়ে এবং নানারূপ কষ্ট দিবার জন্য চেষ্টা করে। এ রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় এই যে, প্রথমে চিন্তা কর যে, তুমি যাহাদের নিকট ভাল হইতে চাও তাহারাও থাকিবে না, তুমিও থাকিবে না, দু'দিন পর সকলেরই

চলিয়া যাইতে হইবে, তখন এমন অসাড় জিনিসে মন লাগান নির্বুদ্ধিতা নয় কি? দ্বিতীয় এলাজ এই যে, এমন কোন কাজ করা, যাহা শরীঅতের খেলাফ নয়, কিন্তু লোকসমক্ষে তাহার কারণে লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হয়। যেমন, বাড়ীর কোন নগণ্য জিনিস বিক্রি করা, তাতে দুর্নাম খুব হয়, কিন্তু শরীঅত অনুযায়ী সম্পূর্ণ জায়েয।

অহঙ্কার ও তাহার প্রতিকার

এল্‌ম, এবাদত, দিয়ানতদারী, দ্বীনদারী, হাছব, ধনদৌলত, চিজ-আসবাব, মান-সম্মান, বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদি কোন গুণে নিজকে বড় মনে করিয়া অন্যকে ক্ষুদ্র এবং হেয় মনে করাকে গরুরী, অহঙ্কার এবং তাকাব্বুর বলে। ইহা বড়ই সাংঘাতিক রোগ, বরং তামাম রোগের মূল এবং অতি বড় গোনাহ্। হাদীস শরীফে আছে, যাহার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও অহঙ্কার থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। এ ত গেল আখেরাত এবং দ্বীনের খারাবী। এ ছাড়া দুনিয়াতে যদিও সাক্ষাতে ভয়ে কেহ কিছু না বলে বরং সম্মান করে কিন্তু মনে মনে সকলেই অহঙ্কারীকে বড়ই ঘৃণা করিয়া থাকে এবং সুযোগে শত্রুতা করিয়া প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। আর এক খারাবী এই যে, এ রকম অহঙ্কারী লোক কাহারও নছীহত কবূল করে না। কেহ সৎপরামর্শ দিলে তাহাও গ্রহণ করে না; বরং খারাপ মনে করে এবং নছীহতকারীকে কষ্ট দিতে চায়। এহেন মারাত্মক রোগের অমোঘ ঔষধ এই যে, তুমি কি? এবং কে? একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। চিন্তা করিয়া দেখ যে, তুমি ত সেই মাটিই যাকে দিবারাত্রি লোকে পদদলিত করিতে থাকে, তোমার মূল ত সেই এক বিন্দু দুর্গন্ধময় অপবিত্র পানিই, যাহা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া বাহির হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি তোমার মধ্যে কোন গুণ, কোন কামাল আসিয়া থাকে তাহা তোমার বাহুবলে অর্জিত নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে দান করিয়াছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন এই ক্ষণেই সবই কাড়িয়া নিতে পারেন এবং তোমাকে সম্পূর্ণভাবে সর্বগুণহীন করিয়া দিতে পারেন এবং এতদ-সত্ত্বেও কোন সামান্য কামালিয়াতের উপর ফখর করা আহ্‌মকী নয় কি? ইহা তো গেল নিজের স্বরূপ এবং "নিজে কিছু না হওয়ার"র চিন্তা করার কথা। এ ছাড়া আরও চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কত বড়! সমস্ত কামাল ত তাঁহার মধ্যে কত অসীম ও অনন্ত পরিমাণে বিদ্যমান! আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে নিজের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যাইবে; কামালিয়াত ত অনেক দূরের কথা। এতদ্ব্যতীত যাহাকে তুমি ক্ষুদ্র এবং হেয় বলিয়া মনে কর, তাহার সহিত জোর-জবরদস্তি নম্র ব্যবহার করিবে এবং তাহাকে সম্মান করিবে; তাহা হইলে অহঙ্কার নিজেই চলিয়া যাইবে। আর যদি কিছু না হয়, যদি এতটুকু করিতে পার যে, কোন সামান্য লোককে দেখিয়া প্রথমেই তাহাকে সালাম কর, তবেও নফ্‌সের মধ্যে অনেক আজিযী আসিয়া যাইবে এবং ক্রমশঃ দাম্ভিকতার স্থলে নম্রতা স্থান পাইতে থাকিবে।

আত্মগর্ব ও তাহার প্রতিকার

যদিও অন্য কাউকে হেয় মনে না হয়, কিন্তু নিজেকেই নিজে ভাল মনে করা বা নিজের কোন জিনিসের উপর গর্বিত হওয়া, যেমন ভাল কোন কাপড় পরিয়া গর্ব-ভরে চলা ইহাও বড়ই খারাপ। হাদীস শরীফে আছে— এই দোষ লোকের দ্বীনকে বরবাদ করিয়া ফেলে। তাছাড়া যে নিজেকে ভাল বলিয়া মনে করে সে নিজের দোষ-ত্রুটি কখনও এছলাহ করিতে পারে না। কেননা, যে

প্রথম হইতেই নিজেকে দোষ ত্রুটিশূন্য মনে করিয়া বসিয়াছে সে ত কখনো চিন্তাও করিবে না যে, তাহার মধ্যে কোন দোষ আছে। (আর চিন্তাই সমস্ত এছলাহের মূল।)

নিজের দোষ এবং আয়েবগুলি এক এক করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ (এবং সংশোধনে তৎপর হও) এবং মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাও যে, যদি তোমার মধ্যে কোন গুণ থাকিয়া থাকে, তবে তাহা আল্লাহ্ তা'আলারই দান, তোমার কিছুই নয়। এই চিন্তা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার শোক্‌র কর এবং দো'আ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে এই নেয়ামত হইতে মাহ্‌রূম না করেন। (এইরূপে চিন্তা করিতে থাক এবং এরূপে হিম্মতের সঙ্গে কাজ করিতে থাকাই এই রোগ হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায়।)

রিয়াকারীর দোষ ও তাহার প্রতিকার

(কোন কাজ লোক দেখানের জন্য করাকে রিয়া বলে। রিয়া অতি বড় গোনাহ্। এমন কি, কিয়ামতের দিন রিয়ার কারণে অনেক নেক আমলের সওয়াবের পরিবর্তে উল্টা আযাব মিলিবে।) রিয়া নানা প্রকার হয়, কোন সময় ত নিজের মুখেই বলিয়া ফেলে। যেমন কেহ বলে যে, আমি এত পরিমাণ কোরআন শরীফ পড়িয়াছি বা আমি রাত্রে উঠিয়া থাকি। কখনো অন্য কথার প্রসংগে বলা হয়, যেমন কোন মজলিসে বন্ধুদের মধ্যে কথা হইতেছিল, একজনে বলিয়া উঠিল, না এ সবই মিথ্যা কথা, "আমাদের কাফেলার সঙ্গে এই এই রকম ভাল ব্যবহার করিয়াছিল;" এখানে কথা প্রসঙ্গে সে জানাইয়া দিল যে, সেও হজ্জ করিয়াছে। কখনো কোন কাজ করায় রিয়া হয়, কেহ মানুষকে দেখাইবার জন্য হাতে তসবীহ্ লইয়া আসিয়া লোকসমক্ষে বসিয়া যায়। কখনো কাজটাকে একটু আরও ভাল করিয়া করায় রিয়া হয়; যেমন কোরআন শরীফ ত সব সময়ই পড়িয়া থাকে, কিন্তু দশজন লোকের মধ্যে মুখ বানাইয়া পড়ে। কখনো বা আকারে প্রকারে রিয়া হয়, যেমন চক্ষু বন্ধ করিয়া ঘাড় নোয়াইয়া বসিয়া থাকে, লোকে ভাবিবে যে, বড়ই দরবেশ, সব সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকেন, রাত্রে ঘুমান নাই তাই চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। এইরূপে এই রিয়া রোগ আরও কয়েক প্রকারের হয়। যেই ভাবেই হউক রিয়া বড়ই সাঙ্ঘাতিক রোগ। পূর্বে সুখ্যাতি আকাঙ্ক্ষার যে সব এলাজ লেখা হইয়াছে, তাহাই এই রোগেরও এলাজ। কেননা, লোক দেখাইবার জন্য যে সব কাজ লোকে করে তাহাও এই জন্যই করিয়া থাকে যে, লোকে ভাল বলিবে, প্রশংসা করিবে, সুনাম রটিবে। (তাই উভয় প্রকার রোগের এই এলাজ।)

কয়েকটি জরুরী কথা

উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের যে সব এলাজ এ পর্যন্ত লেখা হইয়াছে তাহা দুই চারি বার আমল করিলেই যে সেসব দোষ হইতে মুক্তি পাওয়া গেল তাহাও নহে; বরং বহুকালব্যাপী, (এমন কি সারা জীবনব্যাপী) এই ভাবেই আমল করিতে থাকিবে। (এক মুহূর্তও গাফেল হইলে চলিবে না, নফ্‌সের কোন বিশ্বাস নাই, নফ্‌স বড়ই দুষ্ট, নফ্‌সের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিত হইয়া যাওয়া নির্বুদ্ধিতা মাত্র! কখনো যদি ভুল হইয়া যায়, তবে মনে মনে নেহায়েত আফসোস এবং আক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবে। এইরূপ করিতে করিতে আল্লাহ্ চাহে ত একদিন নফ্‌সের দুষ্টামি শেষ হইতে পারে। উদহরণস্বরূপ যেমন রাগকে দুই চারিবার দমন করিয়া বুঝিবে না যে, এই রিপু হইতে মুক্তি পাইয়াছ, বা দুই চারিবার যদি রাগ না আসে, তবে ধোঁকা খাইবে

না যে, তোমার নফ্‌সের বোধ হয় এছলাহ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; বরং নফ্‌সের শত্রুতা হইতে আমরণ সতর্ক থাকিতে হইবে। হাঁ, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ যে, প্রথম প্রতিবন্ধকতা করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয় বটে; কিন্তু ক্রমশঃ এই কষ্টের লাঘব হয়।

আরও জরুরী একটা কথা

নফ্‌সের মধ্যে যে দুষ্টামি ও দোষ আছে এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা যেসব গোনাহ্ হয়, এ সবের জন্য এক সহজ ঔষধও আছে। তাহা হইল এই যে, যখনই নফ্‌স কোন দুষ্টামি করে বা গোনাহ্ হয়, তখনই নফ্‌সকে কিছু শাস্তি দান কর। আর সাধারণতঃ দুই প্রকার শাস্তিই সহজসাধ্য। (১) যখনই কোন অন্যায় কাজ কর, তখনই নিজের অবস্থানুসারে আনা দু'আনা বা টাকা দু'টাকা জরিমানা করিয়া তাহা গরীবকে দাও। আবার যদি সেই কাজ কর, আবার জরিমানা দাও। (২) কোন অন্যায় কাজ করিয়া বসিলে দুই-এক ওয়াক্ত নফ্‌সকে না খাওয়াইয়া রাখ। আশা করা যায় যে, যদি কেহ এইরূপ শস্তির বিধান করিতে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মুক্তি দান করিতে পারেন।

এপর্যন্ত মানুষের মধ্যে যেসব দোষ সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার সংশোধনের বয়ান ছিল, এক্ষণে যে সব কাজে মানুষের মন নূরে আলোকিত এবং সুসজ্জিত হয় তাহার বয়ান করা হইবে!

তওবা এবং তাহার প্রণালী

তওবা এমন ভাল কাজ যে, ইহা দ্বারা সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। যে নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং দেখে যে, অনবরত আমার দ্বারা কোন না কোন গোনাহ্ হইতেই থাকে, সে নিশ্চয়ই সব সময়ের জন্য তওবাকে জরুরী মনে করিবে। তওবার ভাব মনের মধ্যে জাগাইবার উপায় এই যে, কোরআন হাদীসে গোনাহ্‌র কারণে যে সমস্ত আযাবের কথা বলা হইয়াছে, সে সব স্মরণ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। যখন ভালরূপ চিন্তা করিবে তখন নিশ্চয়ই মন গলিয়া যাইবে এবং মনে এক প্রকার অনুতাপ ও লজ্জার ভাব উদয় হইবে। যখন মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইবে, তখন মুখেও স্বীকার করিয়া লইবে এবং যেসব নামায, রোযা ইত্যাদি ছুটিয়া গিয়াছে সে সব ক্বাযা করিয়া লইবে; আর যদি কোন মানুষের কোন হক নষ্ট করিয়া থাক তবে তাহার নিকট হইতে মাফ করাইয়া লইবে বা পরিশোধ করিয়া দিবে। আর যদি এছাড়া অন্য কোন গোনাহ্ হইয়া থাকে, তবে মনে মনে খুব দুঃখিত হইবে এবং যথাসাধ্য কাতরস্বরে করজোড়ে ও নম্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাফ চাহিবে (এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে, এমন আর কখনো করিব না!) এই হইল আসল তওবা।

আল্লাহ্ তা'আলার ভয়

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলিয়াছেনঃ আমার ভয় মনে জাগাইয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় এমন উত্তম জিনিস যে, ইহা যদি মানুষের মধ্যে থাকে, তবে গোনাহ্ হইতে পারে না। তওবার প্রণালীই ইহার প্রতিকারের তরীকা, আল্লাহ্ তা'আলার সেই ভীষণ আযাবের কথা চিন্তা করিয়া দেখ এবং স্মরণ কর।

আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা রাখা

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, তোমরা আমার রহমত ও অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। এই আশা এমন ভাল জিনিস যে, ইহাতে সৎকাজে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং তওবা করিবার হিম্মত জন্মে। আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা মনের ভিতর জন্মাইবার উপায় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ও অপার রহমতের কথা মনে করিয়া চিন্তা করিবে।

ছবর

নফ্‌সকে দ্বীনের কাজের পাবন্দ রাখা এবং শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ করিতে না দেওয়াকে ছবর বলে। বছর কয়েক প্রকার।

প্রথম প্রকার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মান-সম্মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, চাকর-নকর, গাড়ী-ঘোড়া, আওলাদ-ফরযন্দ, দালান-কোঠা ইত্যাদি সব রকমেরই নেয়ামত দান করিয়াছেন। এ অবস্থায় ছবর এই যে, এইসব পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া যাইও না, অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিও না, গরীব-গোরাবাকে হীন মনে করিও না, তাহাদের সঙ্গে যথাসম্ভব সদয় ব্যবহার করিও এবং সাধ্যমত তাহাদের খেদমত করিতে থাকিও।

দ্বিতীয়—এবাদতের সময় ছবর। এবাদত করিতে অনেক সময় নফ্‌স আলস্য করে; যেমন, নামাযের জন্য জাগিতে বা জমা'আতে নামায পড়িতে যাইতে নফ্‌স অলসতা করিয়া থাকে বা কোন সময় কৃপণতাও করে; যেমন, দান-খয়রাত করিবার বা যাকাত দিবার সময় নফ্‌স বখিলী করিয়া থাকে, এইরূপ স্থলে তিন প্রকার ছবরের দরকার। প্রথম, এবাদত শুরু করিবার পূর্বে নিয়ত খুব খালেছ করিয়া লইবে, শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেই করিবে, অন্য কোন নফ্‌সানী গরযে করিবে না। দ্বিতীয়, এবাদতের সময় উৎসাহ ভঙ্গ হইলে চলিবে না, পূর্ণ উৎসাহ এবং হিম্মতের সহিত এবাদত যেমনভাবে করা চাই তেমনভাবে করিবে। এবাদতের হক আদায় করিবে। তৃতীয়, এবাদত করিয়া অন্য কাহাকেও বলিবে না।

তৃতীয়—গোনাহ্‌র সময়ের ছবর। গোনাহ্‌র সময়ের ছবর এই যে, নফ্‌সকে গোনাহ্ হইতে যে রকমেই হয় নিরাপদ রাখিবে।

চতুর্থ—যে সময় কেহ কোন রকম কষ্ট দেয় সেই সময়ের ছবর। এরকম সময়ের ছবর হইল এই যে, যে রকম কষ্টই হউক না কেন, যে রকম মন্দই বলুক না কেন, তুমি কোনরূপ প্রতিশোধ লইও না।

পঞ্চম—যে সময় কোন বিপদ-আপদ আসিয়া পড়ে, কোন রোগ পীড়া হয় বা টাকা-পয়সার কোন রকম সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়া যায় বা খাওয়া-পরার কষ্ট হয় বা কোন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু ঘটে, সেই সময়ের ছবর। এরকম সময়ের ছবর এই যে, এরকম সময় শরীঅতের খেলাফ কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করিও না বা বয়ান করিয়া ক্রন্দন করিও না। এই সব প্রকার ছবরই হাছেল

করিবার উপায় এই যে, এই রকম স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা যে সব ছওয়াবের ওয়াদা করিয়াছেন সেই সব স্মরণ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবে এবং মনে মনে এই বিশ্বাস করিবে যে, এ সব আমারই কোন না কোন মঙ্গলের জন্য হইতেছে, যদিও আমি বুঝিতে পারিতেছি না এবং একথা মনকে বুঝাইবে যে, যদিও আমি ছবর না করি, তবে তক্দীরে যা আছে তাহা ত হইবেই, মিছামিছি কেন বে-ছবরী করিয়া ছওয়াব হারাইব?

শোক্র

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনন্ত অনুগ্রহ দেখিয়া মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি জমান এবং মনে মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়া যে, যে-জন (অযাচিতভাবে) আমাকে এইসব সামগ্রী দান করিয়াছেন (সে জনের এবাদত না করিয়া কেমন করিয়া পারা যায়? অতএব,) প্রাণপণে তাঁহার এবাদত করা চাই এবং নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকা চাই। কেননা, এহেন উপকারী জনের আদেশ অমান্য করা বড়ই লজ্জার কথা। ইহাকেই শোক্র বলে। মানুষের উপর অনবরত আল্লাহ্র অসীম অনন্ত নেয়ামতরাশি বর্ষিত হইতেছে, এমনকি যদি কোন মুছীবতও আসে, তবে তাহাতেও মানুষের অসংখ্য মঙ্গল নিহিত থাকে। (কেননা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করিলে তাহাতে অনেক ছওয়াবও পাওয়া যায় এবং নফ্সের এছলাহও হয়,) কাজেই তাহাও নেয়ামতই। অতএব, যখন দেখা গেল যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ আমাদের উপর অনবরত বর্ষিত হইতেছে, তখন আল্লাহ্র সঙ্গে অগাধ মহব্বত এবং প্রগাঢ় ভক্তি অনবরত থাকা চাই এবং আল্লাহ্র হুকুমগুলি পালন এবং বিন্দুমাত্র আদেশও যেন লঙ্ঘন না হয় সে জন্য সতত তৎপর থাকা চাই।

শোক্র হাছেল করিবার উপায় এই যে, কিছুক্ষণ নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্র নেয়ামত ও অনুগ্রহরাশি চিন্তা করিবে (এবং এই উপায়ে আল্লাহ্র মহব্বত বর্ধিত করিতে চেষ্টা করিবে)।

কতকগুলি উপদেশ—(পরিবর্ধিত)

খোদার ভয় দেলে রাখ। পাপ কাজ করিও না। ওযূ করিয়া নামায পড়। নামাযী মানুষ আল্লাহ্র পেয়ারা হয়। বেনামাযী আল্লাহ্র রহ্মত হইতে দূরে থাকে। গরীবের বদদোআ লইও না। গরীবকে তুচ্ছ বা অত্যাচার করিও না। অযথা কোন জীবজন্তুকে কষ্ট দিও না। বিড়াল কুকুর বা গরু বাছুরকে অযথা মারিও না বা গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে অনাহারে কষ্ট দিও না। মা-বাপের কথা শুন। মা-বাপের প্রহারকে গৌরব মনে কর। প্রাণের সহিত মা-বাপের খেদমত কর। বেহেশ্ত মা-বাপের পায়ের তলে। মা-বাপের কথার পাল্টা জওয়াব দিও না। মা-বাপ রাগ করিয়া কোন কথা বলিলে বা তিরস্কার করিলে চুপ করিয়া তাহা সহ্য কর। কোন বিষয়ে মা বাপের মনে কষ্ট দিও না। মা, বাপ, ওস্তাদ, পীর এই চারিজনকে প্রাণের সহিত ভক্তি কর। মুরব্বিদের সামনে আদব-তমীযের সাথে থাক। ছোটদের স্নেহ কর। বড়দের ভক্তি কর; আলেমদের সম্মান কর; কাহাকেও তুচ্ছ করিও না। ছোট ভাই-বোনদের সহিত বা পাড়া-প্রতিবেশীদের সহিত ঝগড়া-কলহ বা মারামারি করিও না। যাহার মধ্যে নম্রতা গুণ আছে, তাহাকে সকলে ভালবাসে। অহঙ্কারীকে সকলেই ঘৃণা করে। পরের দোষ দেখিও না। পানির গ্লাস এবং চা'এর পেয়ালা ডান হাতে ধরিয়া পানি এবং চা পান কর। বাম হাতে খাওয়া-পিয়া শয়তানের কাজ। তিন শ্বাসে পান কর। ভাত সালুন কিছু ঠাণ্ডা করিয়া খাও। বেশী গরম খাওয়াতে বরকত থাকে না। মিথ্যা কথা বলিও না।

সদা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা বলা মহাপাপ। সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া আউযুবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ্ এবং লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ কলেমা পড়িবে এবং মুরব্বিদের সালাম করিবে। ফজরের নামায পড়িয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিবে। ছবক ভালমত ইয়াদ করিবে। বার বার কছম খাইবে না। নিজের বই, কিতাব, দোয়াত, কলম, নিজের কাপড়, বিছানা-পত্র নিজেই যত্ন করিয়া রাখিবে, যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিবে না। কাহাকেও ঠাট্টা করিবে না বা কাহাকেও ভেঙ্গাইবে না। নাক বাম হাত দিয়া ছাফ করিবে। জুতা পরিবার সময় আগে ডাইন পায়ে পরিবে পরে বাম পায়ে পরিবে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পেশাব করিও না। পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হইয়া পেশাব পায়খানা করিতে বসিও না। কাহাকে খাইতে দেখিলে তথায় যাইয়া বসিও না। পরিশ্রমী হও। অলস হইও না। অপব্যয় করিও না। বিলাসিতা করিও না। কৃষি কাজকে ঘৃণা করিও না। —অনুবাদক

তাওয়াক্কুল

[আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা]

প্রত্যেক মুসলমানেরই ঈমান (অকাট্য বিশ্বাস) আছে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে দুনিয়াতে লাভ-লোকসান বা উপকার অপকারের কোন কিছুই হইতে পারে না। (ইহাই তক্‌দীরের উপর ঈমান আনার সারমর্ম। শরীঅতে যেমন তক্‌দীরের উপর ঈমান রাখার হুকুম আছে তেমনই তদ্‌বীর করারও হুকুম আছে। তক্‌দীরের উপর মজবুত ঈমান এবং পূর্ণ বিশ্বাস ত রাখিতেই হইবে, তারপর সংসার জীবন যাত্রার পথে দৈনন্দিন যত ঘটনা সামনে আসিবে, প্রত্যেক ঘটনার যথারীতি তদ্‌বীরও করিতে হইবে।) কিন্তু, যেমন বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না, তদ্রূপ প্রত্যেক কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক চেষ্টার ফলের জন্য, প্রত্যেক তদ্‌বীরের কামিয়াবীর জন্য ভরসা রাখিতে হইবে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের উপর। ইহাকেই বলে তাওয়াক্কুল। নতুবা তদ্‌বীর না করিয়া হাত-পা গুটাইয়া অকর্মা হইয়া বসিয়া থাকা বা চেষ্টা না করিয়া ফলের আশা করা শরীঅতের বিধান নহে। নিয়ম মত চেষ্টা ও তদ্‌বীর করিতে হইবে। এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কোন আশা করিবে না বা অন্য কাহারও ভয়ে ভীত হইবে না; ভয় শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ্ না-রায না হইয়া যান, আল্লাহ্ না-রায হইলে সর্বনাশ। ইহাকেই বলে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। (তাওয়াক্কুল ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না।)

তাওয়াক্কুল শিক্ষা এবং হাছেল করিবার উপায় এই যে, কিছুক্ষণ সময় নির্ধারিত করিয়া চিন্তা (মোরাকাবা) করিবে যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ্ দয়াময়, আল্লাহ্ মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অন্য কাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বত পয়দা করার নিয়ম

[আল্লাহ্‌কে ভালবাসা এবং ভক্তি করা]

আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রাণের টান থাকা, আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়া প্রাণ গলিয়া যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র কার্য-কলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হওয়াকে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত। ইহা প্রত্যেক মুসলমানের বরং প্রত্যেক মানুষেরই স্বাভাবিক ধর্ম। আল্লাহ্‌র ন্যায় এমন দয়ালু, মহান এবং মহোপকারী জন আর কে আছে?

আল্লাহ্র সঙ্গে মহব্বত করিবার সহজ উপায় এই যে, আল্লাহ্র পবিত্র নাম খুব বেশী করিয়া যিক্র করিবে। আল্লাহ্ যে তোমাকে কত ভালবাসেন (আর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তিনি যে তোমার উপকার করেন, কত অসংখ্য অগণ্য নেয়ামতরাশি যে তুমি তাঁহার বিনা পয়সায় বিনা যাচ্ঞায় অনবরত ভোগ করিতেছ) এবং তিনি যে কত মহান, কত উদার, কত দয়ালু এই সব কথা দৈনিক কতক্ষণ নির্জনে বসিয়া গভীরভাবে চিন্তা (মোরাকাবা) করিবে। এই উপায়ে আল্লাহ্র মহব্বত বাড়িবে।

রেযা-বিলক্কাযা

[আল্লাহ্র হুকুমে রাযী থাকা]

আল্লাহ্ ভাল এবং আল্লাহ্র সব কাজই ভাল, একথা বিশ্বাস করা, স্বীকার করা এবং প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয। তুমি নিজে বিপদ টানিয়া আনিও না; নতুবা আল্লাহ্র তরফ হইতে যদি কোন বিপদ আসে বা কোন কঠিন আদেশ তোমার প্রতি হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহাতে তোমার মঙ্গল নিহিত আছে। কাজেই এরূপ সময়ে অস্থির হইও না, ঘাবড়াইয়া পেরেশান হইও না, মনের মধ্যে বা মুখের কথায় কোন শেকায়েত এ'তেরায বা প্রতিবাদ করিও না, বেজার হইও না; রাযী থাকিও। কারণ আল্লাহ্র তরফ হইতে যে বিপদ আসিবে তাহাতে তোমার গোনাহ্ মাফ হইবে, তোমার দর্জা বুলন্দ হইবে, ছওয়াব হাছেল হইবে, জ্ঞান ও মা'রেফাৎ বাড়িবে ইত্যাদি; তোমার অনেক প্রকার ফায়েদা তাহাতে নিহিত থাকে। এই সব ফায়েদার কথা চিন্তা করিবে এবং আল্লাহ্ যে একটুও মন্দ বা বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠুর নন তিনি যে পরম দয়ালু পূর্ণ মঙ্গলময় এইসব কথা চিন্তা করিবে। তাহা হইলে সহজেই রেযা-বিলক্কাযা অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুমে রাযী থাকার মর্তবা হাছেল হইবে।

ছেদক ও এখলাছ্ হাছেল করিবার নিয়ম

[দেল খাঁটি করা এবং নিয়ত খালেছ করা]

দ্বীনের কাজে দুনিয়ার কোন গরযের নিয়ত রাখা চাই না। লোকের কাছে 'আদরণীয় বা সম্মানী হইব' এধারণাও করা চাই না এমন কি রোযা রাখিলে পেটের অসুখ সারে বা নামায পড়িলে ব্যায়াম হয় বা হজ্জ করিলে বহু দেশ দেখা যায়, যাকাত দিলে লোক হাত হয়, এইসব নিয়তও করা চাই না। এ সব বিষয় এবাদতের মধ্যে নিশ্চয় আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও নিয়ত হওয়া চাই—শুধু আল্লাহ্কে রাযী করা, আল্লাহ্র কাছে প্রিয়পাত্র হওয়া। তাছাড়া দুনিয়ার এইসব উপকারিতার নিয়ত কখনও করা চাই না; নতুবা নিয়ত খাঁটি ও খালেছ না হইলে কোন এবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায় না।

নিয়ত খালেছ করার উপায় এই যে, এবাদত করিবার পূর্বে কিছু চিন্তা করিয়া লইবে; দেলের মধ্য হইতে অন্যান্য বাজে উদ্দেশ্য সব দূরে নিক্ষেপ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যের কথা দেলে স্থান দিবে। কতক দিন এইরূপে চেষ্টা করিলে সব আয়ত্তে আসিবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিলে কষ্টবোধ হইবে।

মোরাকাবা (আল্লাহ্‌র ধ্যান) হাছেল করিবার নিয়ম

[আল্লাহ্‌র খেয়াল সদাসর্বদা মনে রাখা]

সব সময় দেলের মধ্যে এই খেয়াল রাখিবে যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন, আমি যাহাকিছু করিতেছি, যাহাকিছু কথা বলিতেছি, যা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতেছি, সবই আল্লাহ্ দেখিতেছেন। যদি কোন কু-কাজ করি বা কু-কথা মনে কল্পনা করি, তাহা দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন এবং দুনিয়াতেই শাস্তি দিবেন, না হয় আখেরাতে কিয়ামতের দিন ত শাস্তি দিবেনই। দ্বিতীয়তঃ, এবাদতের সময় (নামায পড়ার সময়, যেকের করার সময়, যাকাত খয়রাত দেওয়ার সময়, রোযা রাখার সময়) এই খেয়াল সব সময় মনে রাখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেখিতেছেন; অতএব, এইসব কাজ ভক্তি ও মনোযোগের সহিত করিতে হইবে। (ইহাতে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হইয়া অনেক পুরস্কার দিবেন, আর যদি অভক্তির সঙ্গে করি বা অলসতা করি, তবে তাঁহার নিকট গোপন কোন কিছুই থাকিবে না, তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। এই চিন্তাটি গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিতে হইবে।) অনবরত চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্‌র খেয়াল এত বাড়িয়া যাইবে যে, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। আল্লাহ্‌র মতের বিরুদ্ধে কোন কল্পনা মনে আসিলেও মনে ব্যথা লাগিবে। (এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া গেলে মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। আল্লাহ্‌র ধ্যান (মোরাকাবা) অমূল্য রত্ন। সকলেরই ইহা হাছেল করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার। ইহা হাছেল করিবার সময় প্রথম প্রথম একটু কষ্ট করিতে হয়, পরে সহজ ও মধুর হইয়া যায়। প্রথম প্রথম মনে থাকিতে চায় না, বার বার মনকে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে হয়। মনে না থাকিলেও মুখে অনবরত আল্লাহ্‌র যেকের করিতে হয়, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সংসর্গের বরকতে ক্রমান্বয়ে মন এমন মজিয়া যায় যে, মুহূর্তের তরেও গাফলত সহ্য হয় না।)

কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে হুযূরে ক্বাল্‌ব হাছেল করার নিয়ত

তোমাকে যদি তোমার ওস্তাদ পীর বা অন্য কোন বড় লোক আদেশ করেন যে, আমাকে কিছু কোরআন শরীফ পড়িয়া শুনাও, তখন তুমি সুন্দর করিয়া পড়িবে এবং যাহাতে একটি যের-যবরও ভুল না যায় এবং একটুও মন এদিক-ওদিক না যায় সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। তদ্রূপ কোরআন শরীফ যখন পড়িতে বস, তখন কিছুক্ষণ এই চিন্তা করিয়া লও যে, আল্লাহ্ সকলের বড়, সকল বাদশাহ্‌র বাদশাহ্; তিনি তাঁহার কালাম আমার দ্বারা পড়াইয়া শুনিতে চাহিতেছেন। যদি আমি সুন্দর করিয়া নির্ভুলভাবে মন লাগাইয়া পড়ি, তবে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা ভুল পড়িলে বা অভক্তি ও অমনোযোগিতার সহিত পড়িলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন এইরূপ চিন্তা করিয়া তারপর পড়া শুরু করিবে এবং খুব ভক্তির সহিত একটুও ভুল না হয় সেইভাবে পড়িবে। যদি কতক্ষণ পড়িলে এই চিন্তা না থাকে, অমনোযোগিতা আসিয়া যায়, তখন পড়া বন্ধ করিয়া কতক্ষণ

আবার ঐরূপ চিন্তা তাজা করিয়া লইবে। কতক দিন এইরূপ মশ্ক করিলে, পরে ঐ চিন্তা খুব গাঢ় হইয়া যাইবে এবং ভুলও হইবে না। মনও লাগিবে, ভক্তি ও মহব্বত বাড়িবে।

নামাযে হুযূরে ক্বাল্ব হাছেলের নিয়ম

নামাযের মধ্যে হুযূরে ক্বালব জরুরী। হুযূরে ক্বালবের অর্থ দেল হাযির করা। হুযূরে ক্বালব হাছেল করার সহজ তরীকা এইঃ (এতটুকু কথা স্মরণ রাখিবে যে, নামাযের মধ্যে যাহাকিছু পড় এবং যাহাকিছু কর, তাহা যেন বে-খেয়ালীর সঙ্গে না হয়; বরং) প্রত্যেক লফ্য খেয়ালের সঙ্গে পড়িবে এবং প্রত্যেক কাজ খেয়ালের সঙ্গে করিবে। নামাযের মধ্যে যখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিয়া দাঁড়াও তখন চিন্তা করিয়া খেয়াল করিয়া দাঁড়াইবে যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন, আমি আল্লাহ্র সামনে ভক্তিভরে নতশিরে তাঁহার দাসত্বের জন্য দণ্ডায়মান হইতেছি। তারপর যখন سُبْحَانَكَ পড় তখন যদি অর্থ বুঝ, তবে ত প্রত্যেক লফ্যে অর্থের দিকেও খেয়াল রাখিবে, নতুবা শুধু লফ্যের দিকেই খেয়াল রাখিবে যে, আমি سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ পড়িতেছি, আমি وَبِحَمْدِكَ পড়িতেছি, এই আমি وَتَبَارَكَ اسْمُكَ পড়িতেছি, (যেমন প্রত্যেকটি লফ্য আমি অন্তরের আন্তরিক ভক্তির সহিত মুখে উচ্চারণ করিয়া মহান আল্লাহ্র সামনে নযরানা স্বরূপ পেশ করিতেছি। যদি আন্তরিক ভক্তির সহিত পেশ না করি, অমনোযোগিতার সহিত পড়ি তবে তিনি ভীষণ রাগ হইবেন, আর ভক্তি ও মনোযোগ দেখিলে তিনি মহা সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক লফ্যের জন্য পৃথক ও নূতনভাবে খেয়াল করিয়া লইবে। তারপর যখন আলহামদু সূরা পড়, তাহাতেও এইরূপ প্রত্যেক লফ্যের দিকে পৃথক ও নূতনভাবে খেয়াল করিয়া পড়িবে। তারপর যখন অন্য কোন সূরা পড়িবে সে সূরাও এইরূপভাবে পড়িবে। তারপর যখন রুকূতে যাইবে তখন খেয়াল করিবে যে, আমি আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করিয়া আল্লাহ্র সামনে দাসত্ব প্রকাশ করিতেছি, ভক্তির পরিচয় দিতেছি। তারপর যখন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়িবে, তখনও উপরোক্তরূপে খেয়াল রাখিয়া পড়িবে। মোট কথা, নামাযের যে শব্দ মুখ হইতে বাহির করিবে, খেয়ালও ঐ দিকে রাখিবে। যখন সজ্দায় যাইবে তখন খেয়াল করিবে যে, আমি আল্লাহ্র সামনে মাথা মাটিতে রাখিয়া আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটা করিতেছি। এইরূপে শেষ পর্যন্ত এইরূপ খেয়ালের সঙ্গে নামায শেষ করিবে। শুধু গড়গড় করিয়া মুখস্থ পড়িয়া যাইবে না। যদি কোন সময় খেয়াল একটু এদিক-ওদিক চলিয়া যায়, তবে পুনরায় জোর করিয়া দেলকে টানিয়া আনিবে এবং নূতন ভাবে খেয়াল জমাইতে থাকিবে। এইরূপে কিছু দিন অভ্যাস করিলে পরে আর দেল তত এদিক-ওদিক যাইবে না।

এইরূপে সহজেই হুযূরে ক্বাল্বের মর্তবা হাছিল হইবে। অনবরত এইরূপ করিতে পারিলে দেখিবে যে, নামাযের মত মজার জিনিস আর নাই।

মুরীদ হওয়ার ফায়েদার কথা

(প্রত্যেক মুসলমানেরই খাঁটি নায়েবে রাসূল পীর তালাশ করিয়া তাঁহার কাছে মুরীদ হওয়ার দরকার।) মুরীদ হওয়ার মধ্যে অনেক ফায়েদা আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি ফায়েদা এখানে লিখিতেছি।

প্রথম ফায়েদা—উপরে যে ক্বালব ছাফ করার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পীরে কামেলের সংসর্গ ও সদুপদেশ ব্যতিরেকে নিজে নিজে শুধু কিতাব দেখিয়া হাছেল করা অতি দুষ্কর। নিজে

নিজে কিতাবের অর্থ বুঝিতে অনেক ভুল হয়। (তারপর আমল করিবার সময় অনেক ভুল হয়। অনেক সময় দুষ্ট নফ্‌সের সহিত সংগ্রাম করিয়া একা একা জয়লাভ করা যায় না। নফ্‌স দুষ্টামি করিয়া অনেক সময় ভুল অর্থ বুঝাইয়া বা অলসতা করিয়া এখন না তখন করিয়া টালবাহানা করে বা একটু কঠিন কাজ দেখিলেই কামচোরাপনা করিতে থাকে, বা যেখানে প্রশংসা সুখ্যাতি দেখে সেখানে ত কাজ করে, আর যেখানে এইসব দেখে না সেখানে কাজ করিতে চায় না।) পীরে কামেলের উপদেশে এবং সাহায্যে নফ্‌সের (এইসব) দুষ্টামি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ফায়েদা—পীরে কামেলের সংসর্গে থাকিলে ও তাঁহার মুখে শুনিলে যেমন তা'ছীর হয়, কিতাব পড়াতে তেমন তাছীর হয় না। কারণ কামেল লোকের নূরানী ক্বাল্‌বেরও তা'ছীর পড়ে, তাঁহার দো'আরও বরকত লাভ হয়। এই ভয়ও আছে যে, যদি কোন নেক কাজে অবহেলা করে বা কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে, তবে পীর ছাহেব অসন্তুষ্ট হইবেন, তাঁহার নিকট শরমেন্দা হইতে হইবে।

তৃতীয় ফায়েদা—কামেল পীরের সংসর্গে থাকিলে তাঁহার সঙ্গে খুব মহব্বত ও ভক্তি পয়দা হয়। কাজেই তাঁহার প্রত্যেক কাজেই অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে আপনা হইতে মন চায়।

চতুর্থ ফায়েদা—পীর ছাহেব কোন নছীহতের কথা বাতাইবার সময় কটুকথা বলিলে বা তিরস্কার করিলেও তাহা খারাপ লাগে না; কাজেই নছীহতের উপর আমল করিবার জন্য আরও বেশী চেষ্টা করে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অনেক ফায়েদা আছে। আল্লাহ্ পাক যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহারই ফায়েদা হাছেল হয়, এবং হাছেল হওয়ার পরই তাহা অনুভব করিতে পারে। (এবং এত ফায়েদা দেখে যে, নিজের জীবন পর্যন্ত পীরের পায়ে কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। মোট কথা, যার উছিলায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়, সে যে কতখানি প্রাণাধিক-প্রিয় হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।)

পীরে-কামেলের শর্ত

যখন কোন পীরের কাছে মুরীদ হইতে ইচ্ছা কর, তখন সেই পীরের মধ্যে এই শর্তগুলি পাওয়া যায় কি না খুব ভাল ভাবে তাহকীক করিয়া লইবে। যদি শর্তগুলি না পাওয়া যায়, তবে মুরীদ হইও না। (উপযুক্ত পীর না হইলে আলেমের কাছে শুনিয়া শুনিয়া শরীঅতের হুকুমগুলি পালন করিতে থাকিবে। এইভাবে সারা-জীবন তালাশ করা সত্ত্বেও উপযুক্ত পীর না পাওয়ার কারণে মুরীদ না হইতে পারিলে কোন গোনাহ্ হইবে না! কিন্তু তালাশ করিতে থাকিবে।)

পীরে কামেলের **প্রথম শর্তঃ** শরীঅতের মাসআলাসমূহ পীরের অবগত হওয়া দরকার। শরীঅত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ না হওয়া চাই।

দ্বিতীয় শর্তঃ তাঁহার মধ্যে শরার বরখেলাফ আকীদা বা আমল না থাকা চাই। এই কিতাবে যে সমস্ত আকায়েদ এবং আমলের কথা লেখা হইয়াছে এবং সুন্নত তরীকা অনুসারে ক্বল্‌ব ছাফ করার যে তরীকা বাতান হইয়াছে, পীর সেগুলির অনুযায়ী হওয়া চাই।

তৃতীয় শর্তঃ যিনি (খাঁটি পীর হইবেন তিনি) অর্থ উপার্জনের জন্য মুরীদ করেন না। (অর্থাৎ পীরী-মুরীদীকে তিনি দুনিয়ার ব্যবসা স্বরূপ করিবেন না, খালেছ নিয়তে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র রাস্তা বাতাইবেন, আল্লাহ্‌র দিকে ডাকিবেন, আল্লাহ্‌র দ্বীন জারি করিবেন।)

চতুর্থ শর্তঃ পীর ছাহেবের এমন কোন কামেল পীরের নিকট মুরীদ হওয়া চাই (তাঁহার ছোহ্‌বতে থাকিয়া নফ্‌সের এছলাহ্ করান চাই এবং তরীকত শিক্ষা করা চাই) যাঁহাকে সমসাময়িক আলেমগণ এবং দ্বীনদার জ্ঞানী লোকগণ কামেল পীর বলিয়া মনে করেন।

পঞ্চম শর্তঃ এই পীর ছাহেবকেও (আকায়েদ, আমল, আখলাখ এবং জীবন যাত্রার ধারা সুন্নতের মোয়াফেক হওয়া চাই; তা-ছাড়া) সমসাময়িক দ্বীনদার আলেমগণও যেন ভাল বলেন।

ষষ্ঠ শর্তঃ পীর ছাহেবের তালীম-তলক্কীনের মধ্যে এমন আছর দেখা যাওয়া চাই যে, যাহাতে লোকের মধ্যে দ্বীনের মহব্বত এবং আখেরাতের শওক পয়দা হয়। (দুনিয়ার রং-তামাশা, নাম-নকশা, জাঁকজমক, অর্থলিপ্সা এবং শান-শওকতের আকাঙ্ক্ষা কম হইতে থাকে।) পীরের মুরীদানদের অবস্থা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। দশজন মুরীদের মধ্যে যদি ৫/৬ জনের অবস্থা এইরূপ দুরুস্ত হয়, তবেই বুঝিবে যে, তিনি খাঁটি পীর। দুই একজনের অবস্থা যদি দুরুস্ত না হয়, তাহাতে পীরের উপর সন্দেহ করিবে না। (তাহা মুরীদেরই চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি বুঝিতে হইবে।) বুযুর্গদের ছোহ্‌বতে বসিলে যে ফয়েয ও বরকত হাছেলের কথা বলা হয়, ইহাই সেই ফয়েয ও বরকত। নতুবা, সে মুখ দিয়া যাহা বলিয়া দেয় তাই হইয়া যায়। একটু ফুঁক দিয়া দিলেই রোগ সারিয়া যায়, যে কাজের জন্য যে তাবীয দেয় সে কাজ সফল হইয়া যায়, তাহার তাওয়াজ্জুহ দেওয়াতে লোক একেবারে বেহুশ হইয়া যায়, তাহার ফয়েযের চোটে লোকে লাফালাফি বা ছট্‌ফট করিতে থাকে; এইরূপ তাছীর যাদুকরেরাও করিতে পারে। কাজেই কোন লোকের মধ্যে যদি এই সব তাছীর দেখ, তবে তাহাতে ধোঁকা খাইও না। (আসল জিনিস শরীঅত এবং সুন্নতের পায়রবী, ভিতরে বাহিরে তাহাই দেখিবে।)

সপ্তম শর্তঃ ঐ পীর ছাহেব এমন হওয়া দরকার যে, সকলকেই যেন তিনি নছীহত করেন এবং দ্বীনের কথা বাতান; খারাপ কাজ করিতে দেখিলে বা শুনিলে যেন নিষেধ করেন এবং শরীঅতের হুকুমগুলি পালন করিতে আদেশ করেন। কাহারও সম্পত্তি বা সম্মানের চাপে বা লোভে পড়িয়া যেন তিনি শরীঅতের হুকুম বাতাইতে ত্রুটি না করেন।

এই শর্তসমূহ যে পীরের মধ্যে পাওয়া যাইবে, দ্বীনকে দুরুস্ত করার জন্য খাঁটি নিয়তে তাঁহার কাছে মুরীদ হইবে (এবং রীতিমত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়া, তাঁহার ছোহ্‌বতে বসিয়া, তাঁহার আদেশ উপদেশ পালন করিয়া, নিজের নফ্‌সের এছলাহ্ এবং দ্বীনের উন্নতি করিবে, তাহাতে ত্রুটি করিবে না)। মেয়ে-লোকের মুরীদ হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, যদি অবিবাহিতা হয়, তবে মা-বাপের এজাযত লইবে; বিবাহিতা হইলে স্বামীর এজাযত লইবে। যদি কোন কারণবশতঃ তাঁহারা এজাযত না দেন, তবে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে মুরীদ হইবে না। কারণ, মুরীদ হওয়া ফরয নয়, শরীঅতের পায়রবী করা ফরয। মুরীদ না হইয়াও যদি শরীঅতের পায়রবী রীতিমত করিতে থাকে এবং সুন্নতের পায়রবী করিতে থাকে, তবে তাহাতে গোনাহগার হইবে না। কাজেই মা-বাপের বা স্বামীর হুকুম অমান্য করিয়া মুরীদ হইবে না, শরীঅতের পায়রবী এবং সুন্নতের পায়রবী করিতে থাকিবে (যখন তাঁহারা অনুমতি দেন তখন মুরীদ হইবে)।

পীরী-মুরীদী সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ

১। উপদেশঃ পীরকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিবে। নফ্‌সের এছলাহ সম্বন্ধে তিনি যে আদেশ-উপদেশ দিবেন তাহা কিছুতেই অমান্য করিবে না, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহা পালন

করিবে। আল্লাহ্‌র যেকের নিজের পীরের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া লইবে। নিজের নফ্‌সের এছলাহের জন্য নিজের পীরকে সবচেয়ে বড় মনে করিবে। (কিন্তু অন্যান্য বুযুর্গদের বা তাঁহাদের মুরীদদের মন্দ জানিবে না বা মন্দ বলিবে না।)

২। **উপদেশ ঃ** নফ্‌সের এছলাহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি পীর ছাহেবের এন্তেকাল হইয়া যায়, তবে উপরোক্ত শর্ত অনুসারে অন্য কোন কামেল পীরের আশ্রয় লইয়া তাঁহার নিকট তা'লীম হাছিল করিবে। (যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ না থাকে, তবে শুধু পীরের ছেলে বা জামাই বা পীরের ভাই বলিয়া তাহাকে পীর বানাইবে না। আসল জিনিস হইল পীরের মধ্যে উপরোক্ত শর্তসমূহ ও গুণগুলি থাকা। ঐ গুণগুলি ব্যতীত পীরের ছেলে হইলেও তাহাকে পীর বলা যাইবে না।

৩। **উপদেশ ঃ** তাছাওওফের কোন কিতাবে কোন ওযীফা দেখিলে বা কোন আলেমের মুখে কোন ওযীফার কথা শুনিলে, তাহা নিজের পীরের কাছে বলিবে। তিনি যদি এজাযত দেন, তবে আমল করিবে, নতুবা করিবে না। এইরূপে দেলের কোন কথা বা কোন এরাদা নিজের পীরের নিকট গোপন করিবে না, যাহাকিছু দেলের অবস্থা হয়—ভাল বা মন্দ পীরকে জানাইবে এবং যাহাকিছু ইচ্ছা বা এরাদা হয় তাহাও পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। (জিজ্ঞাসা করার পর তিনি যেরূপ বলেন সেইরূপ করিবে। কোন কথাই গোপন করিবে না এবং কোন কথাই অমান্য করিবে না।)

৪। **উপদেশ ঃ** মেয়েলোক নিজের পীরকেও দেখা দিবে না এবং মুরীদ হইবার সময় পীরের হাতে হাত দিবে না, পর্দার আড়ালে থাকিয়া রুমাল, পাগড়ী বা চাদর ধরিয়া অথবা শুধু মৌখিক অঙ্গীকার করিয়া মুরীদ হইবে। শুধু মৌখিক অঙ্গীকার করিয়া মুরীদ হইলে তাহাও দুরুস্ত আছে।

৫। **উপদেশ ঃ** যদি কেহ কোন শরার খেলাফ পীরের কাছে মুরীদ হইয়া বসে, অথবা পীর আগে ভাল ছিল পরে বিগড়াইয়া যায়, তবে ঐ পীরকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য কোন ভাল পীরের কাছে মুরীদ হইতে হইবে। যদি কচিৎ কোন কাজ শরীঅতের খেলাফ হইয়া পড়ে এবং সতর্ক করার পর অথবা নিজেই সতর্ক হইয়া যখন তখন তওবা করিয়া লয়, তবে সে কারণে আকীদা খারাব করিবে না। কারণ, পীরও ত মানুষ, তাঁহারও ভুল-চুক হইতে পারে। কাজেই সামান্য সামান্য কারণে দেল খারাব করিবে না। অবশ্য যদি শরার বরখেলাফ বা সুন্নতের খেলাফ কাজের উপর জিদ করিয়া জমিয়া থাকে, তবে সে পীরের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করিবে।

৬। **উপদেশ ঃ** আমাদের সব সময়কার সব অবস্থা (মনের কথা দেলের ভেদ) পীর জানিতে পারে এইরূপ ধারণা রাখা (শেরেকী) গোনাহ্‌।

৭। **উপদেশ ঃ** কোন কোন ফকিরী বা মা'রফতির দাবীদার লোক অনেক সময় অনেক কথা শরার বরখেলাফ বলিয়া থাকে বা কিতাবে লিখিয়া থাকে। খবরদার! ঐ সব লোকের কাছেও যাইবে না বা ঐ সব কিতাবও দেখিবে না। অনেক কবি বা শায়েরও কবিতায় বা শায়েরীর মধ্যে কোন কোন কথা শরার বরখেলাফ বলিয়া ফেলে। তাহাদের কবিতা বা পুঁথি কখনও পড়িবে না।

৮। **উপদেশ ঃ** কোন কোন বেদআতী ফকীর মা'রফতির দাবী করে এবং বলিয়া থাকে যে, (মৌলবীরা মা'রফতির ভেদের কথা কি জানে?) শরীঅতের রাস্তা ভিন্ন তরীকতের (মা'রফতের) রাস্তা ভিন্ন। এইরকম কথা যে বলে তাহাকে মিথ্যুক এবং ধোঁকাবাজ মনে করা ফরয এবং তাহার সংসর্গে কখনও যাইবে না (ক্ষমতা থাকিলে তাহাদিগকে শাসন করাও দরকার)।

৯। উপদেশঃ পীর যদি শরীঅতের খেলাফ বা সুন্নতের খেলাফ কোন কিছু বাতায়, তবে তাহার উপদেশ মত আমল করা জায়েয নহে, আর পীর যদি ঐ খেলাফে শরা কাজ করার উপর (আলেমদের সতর্ক করা সত্ত্বেও) হঠ করিতে থাকে, তবে সে পীরের উপযুক্ত নয়; তাহাকে মানিবে না।

১০। উপদেশঃ আল্লাহ্র যেকেরের বরকতে যদি দেলের মধ্যে কোন ভাল হালাত পয়দা হয় বা ভাল খোয়াব নজরে আসে বা জাগ্রত অবস্থায় কোন গায়েবী আওয়াজ শুনা যায় বা কোন আলো বা নূর দেখা যায়, তবে সেইসব কথা নিজের পীর ব্যতীত অন্য কাহারও কাছে বলিবে না।

এইরূপে নিজের ওযীফার কথা বা নিজের বন্দেগী (—এশরাক, তাহাজ্জুদ, বার-তসবীহ্ যেকের) ইত্যাদির কথাও নিজের পীর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট বলা উচিত নয়। কারণ তাহাতে বরকত নষ্ট হইয়া যায়।

১১। উপদেশঃ পীর কোন ওযীফা বা যেকের বাতাইলে তাহাতে যদি কিছুকাল পর্যন্ত কোন ফায়েদা বা তাছীর অনুভব না হয়, তবে সে কারণে পীরের উপর আকীদা নষ্ট করিবে না। কেননা, সবচেয়ে বড় ফায়েদা এই যে, আল্লাহ্র নাম লওয়ার এরাদা দেলের মধ্যে পয়দা হইতে থাকে এবং এই নেক কাম করার তৌফীক আল্লাহ্ তা'আলা দান করিয়াছেন, (এইরূপ খেয়াল কখনও দেলে পোষণ করিবে না যে, ভাল ভাল খোয়াব কেন দেখি না, রাসূলুল্লাহ্র বা বুযুর্গানে দ্বীনের যেয়ারত খোয়াবের মধ্যে কেন হয় না, গায়েবের খবর কেন জানিতে পারি না, কাশফ কেন হয় না, কারামত কেন যাহের হয় না, খুব কান্না কেন আসে না, এবাদতের মধ্যে একেবারে বেহুস কেন হইয়া যাই না, অছঅছা আমার একেবারে বন্ধ কেন হইয়া যায় না।) কেননা, এইসব জিনিস (কাহারও হয় না, আবার একই লোকেরও) কখনও হয়, কখনও হয় না। কাজেই যদি কাহারও হয়, তবে তাহার (ফখর করা চাই না) আল্লাহ্র শোক্র করা চাই, আর যাহার মোটেই না হয় বা হইয়া বন্ধ হইয়া যায় বা বেশী হইয়া পরে কম হইয়া যায়, তাহার এই কারণে পেরেশান হওয়া ও আফসোস করা চাই না। অবশ্য যদি খোদা না করুন সুন্নতের পায়রবী বা শরার পাবন্দির মধ্যে ত্রুটি হয় বা আলস্য করে বা গোনাহ্র কাজ হয়, তবে তাহা আক্ষেপ এবং পেরেশানির বিষয় বটে। যদি কখনও খোদা নাখাস্তা এইরূপ অবস্থা হয়, তবে অতি সত্বর হিম্মত করিয়া নফ্সের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তওবা এস্তেগ্ফার করিয়া হালাত দুরুস্ত করিয়া লওয়া দরকার এবং পীরকে জানাইবে, পীর ছাহেব যেরূপ বাতান তদনুযায়ী আমল করা দরকার।

১২। উপদেশঃ (নিজের পীরকে ভাল এবং বড় জানিবে একথা সত্য, কিন্তু খবরদার!) অন্যান্য পীর ছাহেবের বা অন্যান্য তরীকাকে কখনও মন্দ জানিবে না, বা অন্য কোন পীরের বা অন্য কোন তরীকার মুরীদানের সঙ্গে এরূপ আলাপ-আলোচনা করিবে না যে, তোমাদের পীরের চেয়ে আমাদের পীর ভাল বা তোমাদের তরীকার চেয়ে আমাদের তরীকা ভাল; এইসব বেহুদা কথায় দেল অন্ধকার হইয়া যায়। (খবরদার! এমন কথা কখনও জবানে আনিবে না; নিজের পীরের বা নিজের তরীকার প্রশংসা ত করা উচিত, কিন্তু প্রশংসা এমন হওয়া চাই না যাহাতে অন্যের প্রতি কটাক্ষ বা দোষারোপ হয়।)

১৩। উপদেশঃ (পীর-ভাইদের সঙ্গে গাঢ় মহব্বত রাখা দরকার।) যদি কোন পীর ভাইয়ের তরক্কী বেশী দেখা যায় বা পীরের তাওয়াজ্জুহ (নেক দৃষ্টি) কাহারও দিকে বেশী দেখা যায় তবে খবরদার! সেজন্য মনে কোন গ্লানি আনিবে না বা হিংসা করিবে না। (বরং এই মনে করিবে যে,

সে কাজে ভাল করিতেছে বলিয়াই ফল বেশী পাইতেছে; আমার এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টার সহিত কাজ ভাল করা দরকার)।

নিম্নের উপদেশগুলি হামেশা পালন করিবে

১। আবশ্যক পরিমাণ এলমে-দ্বীন প্রত্যেকেরই হাছেল করা দরকার, তাহা কিতাব পড়িয়া হাছেল করুক বা (আলেমদের ছোহ্‌বতে থাকিয়া) জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া হাছেল করুক—(অনবরত ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি করা দরকার।)

২। সমস্ত গোনাহ্‌ হইতে বাঁচিয়া থাকা দরকার।

৩। যদি কোন সময় কোন গোনাহ্‌র কাজ হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তওবা করিবে।

৪। কাহারও কোন হক নষ্ট করিবে না। শরীকী অংশ বা দেনা রাখিবে না।) কাহাকেও কোন কথা বা কোন ব্যবহারে মনে কষ্ট দিবে না। কাহারও নিন্দাবাদ বা গীবত-শেকায়েত করিবে না।

৫। অর্থ-লোভ ও নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না। (বিলাসিতা ও অলসতা বর্জন করিবে, কাজ করিতে আলস্য বা লজ্জাবোধ করিবে না।) ভাল খাওয়া-পরা, ভাল আসবাবপত্র যোগাড় করার চিন্তায় পড়িবে না।

৬। যদি কোন কথায় বা কাজে ভুল হইয়া যায় এবং পরে (নিজের ভুল বুঝে আসে বা) অন্য কেহ ভুল ধরিয়া দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ ভুল স্বীকার করিয়া লইবে এবং ক্ষমা চাহিবে ও তওবা করিবে।

৭। বিনা জরুরতে সফর (বিদেশ ভ্রমণ) করিবে না, (জরুরত—যেমন তেজারতের জরুরত, তলবে এলমির জরুরত, হজ্জের জরুরত, জেহাদ বা তবলীগের জরুরত ইত্যাদি।) কারণ, সফরের মধ্যে সব কাজ ঠিকমত করা যায় না; অনেক নেক কাজ ছুটিয়া যায় এবং ওযীফা ছুটিয়া যায়। (আজকাল সফরের মধ্যে চক্ষু বাঁচাইয়া রাখার এবং পর্দার হেফাযতের খাছ করিয়া ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক সময় অনেক ফাহেশা কথা বেহুদা লোকেরা লিখিয়া রাখে বা ফাহেশা ছবি লটকাইয়া রাখে, সে সব হইতে চক্ষুকে এবং মনকে বাঁচাইয়া রাখা একান্ত দরকার।)

৮। বেশী হাসিবে না, বেশী কথা বলিবে না; বিশেষতঃ মেয়েলোকেরা গায়ের মাহ্‌রাম লোকের সঙ্গে হাসি-চাতুরি ত করিবেই না, জরুরী কথা ছাড়া অতিরিক্ত বাজে কথাও বলিবে না।

৯। কাহারও সহিত ঝগড়া-কলহ বা তর্কবিতর্ক করিবে না।

১০। প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক কথায় শরীঅতের পাবন্দি এবং সুন্নতের পায়রবির খেয়াল রাখিবে।

১১। (নামায, রোযা এবং অন্যান্য) এবাদতের মধ্যে কখনও অলস্য (বা অবহেলা) করিবে না।

১২। (বিনা জরুরতে লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিবে না। জরুরত মত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আবার নিজের কাজে লিপ্ত হইবে।) অধিকাংশ সময় নির্জনে থাকিবে। (একাকী খোদার ধ্যানে থাকাকেই বেশী ভালবাসিবে। অন্ততঃ দৈনিক কিছু সময় একাকী নির্জনে বসিয়া খোদার ধ্যান এবং খোদার যেকেরের জন্য অবশ্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিবে)।

১৩। যখন অন্য লোকের সঙ্গে মিলিয়া থাকার বা চলার দরকার পড়ে, তখন সকলের সামনেই নিজকে ছোট মনে করিয়া নম্রভাবে সকলের খেদমত করিবে। নিজেকে অন্যের চেয়ে